

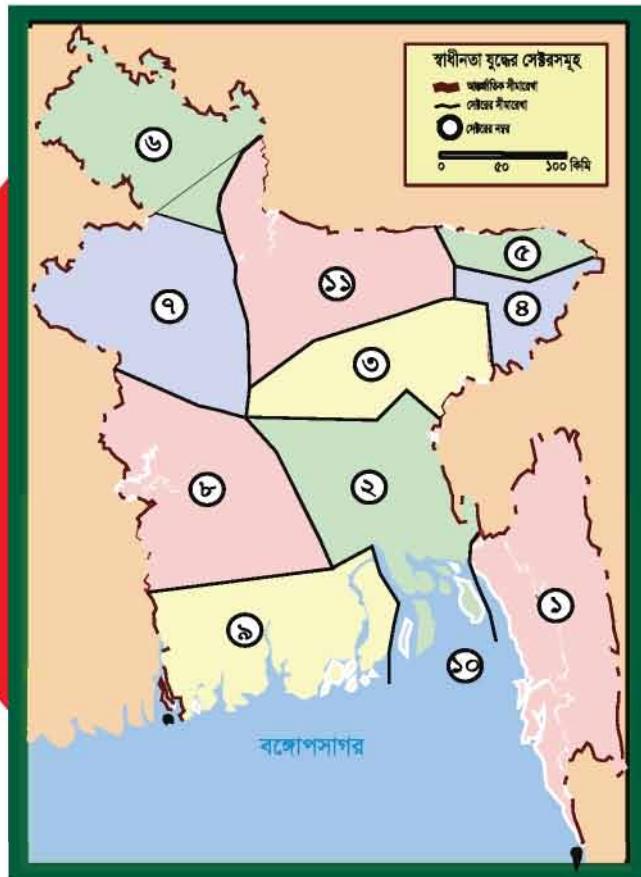
সিদ্ধুর্ধ ও নেতৃত্ব শিক্ষা



সপ্তম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর

১ নং সেক্টর- চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালী জেলার পূর্বাঞ্চল, ২ নং সেক্টর- নোয়াখালীর অংশবিশেষ, কুমিল্লার অংশবিশেষ, আখাউড়া, তৈরৰ এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ, ৩ নং সেক্টর- কুমিল্লার অংশবিশেষ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকার অংশবিশেষ, ৪ নং সেক্টর- সিলেটের পূর্বাঞ্চল, ৫ নং সেক্টর- সিলেটের পশ্চিমাঞ্চল, ৬ নং সেক্টর- রংপুর ও ঠাকুরগাঁও, ৭ নং সেক্টর- রাজশাহী ও দিনাজপুরের অংশবিশেষ, ৮ নং সেক্টর- কৃষ্ণঘাট, যশোর, ফরিদপুর ও খুলনার অংশবিশেষ, ৯ নং সেক্টর- সাতক্ষীরা ও খুলনার অংশবিশেষ, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা, ১০ নং সেক্টর- নৌ সেক্টর অর্থাৎ সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ও অভ্যন্তরীণ নৌ পথ, ১১ নং সেক্টর- ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল।

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের রংকোশল হিসেবে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টর ও ৬৪টি সাব সেক্টরে ভাগ করা হয়। প্রতিটি সেক্টরের নেতৃত্বে ছিলেন একজন সেক্টর কমান্ডার। কমান্ডারদের সফল নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মুক্ত হয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। এভাবে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জিত হয়। বিভিন্ন সেক্টরের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি যুদ্ধে রয়েছে- কামালপুর যুদ্ধ, বিলেনিয়ার যুদ্ধ, ভাটিয়াপাড়ার যুদ্ধ, রাধানগর যুদ্ধ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

রচনা

প্রফেসর ড. পরেশ চন্দ্র মঙ্গল
প্রফেসর ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক
বিষ্ণু দাশ
ড. ধীরেন্দ্রনাথ তরফদার
ড. শিশির মল্লিক
শিখা দাস

সম্পাদনা

প্রফেসর নিরঞ্জন অধিকারী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংকরণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২১

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষান্বিতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্গ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্প্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামূল্ক করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির হিন্দুধর্ম পাঠ্যপুস্তকটির নামকরণ করা হয়েছে হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা। এ পাঠ্যপুস্তকে হিন্দু ধর্মের তাত্ত্বিক বিষয় ও বিধানসমূহ এবং এ ধর্মের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবন ও কর্মে প্রতিফলিত করার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া হিন্দুধর্মের বিধানসমূহ, হিন্দু ধর্মসমূহে বর্ণিত কিছু জীবনাদর্শ, উপাখ্যান, অবতার, মহাপুরুষ মহীয়সী নারীদের জীবনচরিত ও বাণী সম্পর্কে এ বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায় এ সকল বিষয় শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিক গুণাবলি যেমন-সততা, উদারতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সৎ সাহস, সংযম, সহনশীলতা, নারীর প্রতি মর্যাদাবোধ, অসাম্প্রদায়িকতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, সাম্য ও ভাস্তৃবোধ জাগ্রত করবে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশান্তি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ঈশ্বরের স্বরূপ	১-৮
দ্বিতীয়	ধর্মগ্রন্থ	৯-১৭
তৃতীয়	হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও বিশ্বাস	১৮-২৬
চতুর্থ	নিত্যকর্ম ও যোগাসন	২৭-৩৩
পঞ্চম	দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ	৩৪-৪০
ষষ্ঠ	ধর্মীয় উপাখ্যানে নৈতিক শিক্ষা	৪১-৪৯
সপ্তম	আদর্শ জীবনচরিত	৫০-৬৮
অষ্টম	হিন্দুধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ	৬৯-৭৯

প্রথম অধ্যায়

ইশ্বরের স্বরূপ

এ বিশ্বব্রহ্মাতের সকল প্রাণী ও বস্তুর একজন স্তুতি রয়েছেন। যাকে আমরা সৃষ্টিকর্তা বা ইশ্বর বলি। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি নিরাকার, তবে তিনি সাকার রূপও ধারণ করতে পারেন। যেমন— অবতার, দেব-দেবী প্রভৃতি তাঁর সাকার রূপ। এ অধ্যায়ে স্তুতি এবং ইশ্বর শব্দের অর্থ, ইশ্বরের স্বরূপ এবং ইশ্বরের একত্ব সম্পর্কে আগোচনা করা হয়েছে।



এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- স্তুতি এবং ইশ্বর শব্দ দুটির অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব
- ইশ্বরের নিরাকার ও সাকার সম্পর্কিত ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ইশ্বরের সাকার রূপের বর্ণনা করতে পারব
- ইশ্বরের একত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- ইশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি সহজ সংকৃত শ্ল�ক সরলার্থসহ বলতে পারব এবং ব্যাখ্যা করতে পারব
- ইশ্বরের বিভিন্ন সাকার রূপের মধ্যে ইশ্বরের একত্ব উপলব্ধি করে তাঁর উপাসনায় উদ্বৃদ্ধ হব।

পাঠ ১ : মুক্তা ও ইশ্বর শব্দের অর্থ

মুক্তা মানে যিনি সৃষ্টি করেন। যেমন মূর্খলিঙ্গী মাটি দিয়ে হাড়ি-পাতিল, খেলনা, প্রতিমা ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। কিন্তু তিনি মাটি সৃষ্টি করতে পারেন না। শুধু মাটিই নয়, আমরা জল, নদী-সমুদ্র, চন্দ, সূর্য, শৃঙ্খল, জীব-জন্ম ইত্যাদি সৃষ্টি করতে পারি না। যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে মুক্তা বা সৃষ্টিকর্তা বলা হয়। এ সকল সৃষ্টির পিছনে এক অসীম শক্তি বিদ্যমান করছে। এ অসীম শক্তির বলেই সবকিছু একটি নিয়মের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হচ্ছে। যিনি এই মহাশক্তিশর তাঁকে মুক্তা বা সৃষ্টিকর্তা বলা হয়। এ মুক্তা বা সৃষ্টিকর্তাকে আমরা ইশ্বর বলি।



ইশ্বর শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রভু। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি শূর্জনার সঙ্গে জীব-জগতকে নিরাশ্রম করেছেন। সকল শক্তি ও গুণের তিনিই আধার। সূর্যের আলো তাঁরই আলো। তিনিই জীবের মধ্যে আস্তা রূপে অবস্থান করেন। তিনি সৃষ্টি, বিশ্বাস ও পালনের একমাত্র কর্তা। তিনিই মৃত্যুর শীমার জীবনকে বেধে দিয়েছেন। এভাবেই তিনি জীব ও জগতের উপর প্রভুত্ব করেন। এ জন্যই তাঁর নাম ইশ্বর। তাঁর আদি নেই, তাই তিনি অনাদি। তাঁর অস্ত নেই, তাই তিনি অনস্ত। তাঁর বিনাশ নেই, তাই তিনি অবিনাশ।

হিন্দু ধর্মানুসারে আমরা মুক্তাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করি। যেমন – শ্রুতি, ইশ্বর, ভগবান, পরমাত্মা ইত্যাদি। এ পৃথিবীতে আরো অনেক ধর্মসত্ত্ব আছে। যেমন – ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ ইত্যাদি। বিভিন্ন ধর্মে মুক্তাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হচ্ছে। যেমন–আত্মাহ, খোদা, গড় ইত্যাদি। এক মুক্তারই বিভিন্ন নাম। ইশ্বর মুক্তার একটি নাম।

একক কাজ : মুক্তা ও ইশ্বরের সম্মুখ ব্যাখ্যা কর।

পাঠ ২ ও ৩ : ইশ্বরের স্মৃতি - পিলাকার ও সাকার

পৃথিবীতে এমন অনেক বস্তু রয়েছে, যাদের আকার আছে। যেমন—
ইশ্বরের সৃষ্টি সকল জীব-মানুষ, জীবজন্ম ও পাহলালা। আবার অনেক কিছু
আছে, বেগুলোর আকার নেই। যেমন বায়ু, আলো, শব্দ, পর্য ইত্যাদি।





ଇଶ୍ୱରର କୋନୋ ଆକାର ନେଇ । ଇଶ୍ୱର ନିରାକାର । ତାକେ ଦେଖା ଯାଇ ନା । କିନ୍ତୁ ଆମରା ତୌର ଅସିତ୍ତ ଅନୁଭବ କରି ।

ତବେ ଇଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ । ତିନି ନିଜ ଅସୀମ ଓ ଅନୟ ଶକ୍ତିର ବଳେ ସେ କୋନୋ ଆକାର ଧାରଣ କରତେ ପାରେନ । ଇଶ୍ୱରର ସାକାର ରୂପ ନାନା ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପେଯେଛେ ।

ଏକ. ଇଶ୍ୱର ନିଜେକେ ବା ନିଜେର ଅଞ୍ଚଳିଶେଷକେ ସାକାର ରୂପ ଦାନ କରେନ । ଏ ରୂପଗୁଲୋ ହଲୋ ଅବତାର ଓ ଦେବ-ଦେଵୀ ।

ଦୁଇ. ଇଶ୍ୱର ନିଜେଇ ଜୀବେର ମଧ୍ୟେ ସଥଳ ଆଆ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ, ତଥନ ତାକେ ଜୀବାଆ ବଳା ହୁଏ ।

ଅବତାର

ଯଥନ ଧର୍ମର ଗ୍ରାନି ଉପର୍ହିତ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟାଯ ଅବିଚାରେ ବିଶେଷତ ହୁଏ ମାନବଜୀବନ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ଅଭ୍ୟାନ ଘଟେ ତଥନ ଇଶ୍ୱର କୋନୋ ନା କୋନୋ ରୂପ ଧାରଣ କରେ ପୃଥିବୀତେ ଅବତରଣ କରେନ । ଅବତରଣ ଶଦ୍ଵିତିର ଅର୍ଥ ନେମେ ଆସା । ଇଶ୍ୱର ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୃଥିବୀତେ ଅବତରଣ କରେନ ବଳେ ତାକେ ଅବତାର ବଳା ହୁଏ । ଯେମନ— ଇଶ୍ୱର ତ୍ରେତାୟଙ୍କେ ରାମରୂପେ ଅବତାର ହେଉଛିଲେ । ରାମ ଅବତାରେ ତିନି ରାବଣସହ ଦୁର୍ଗାଭୂଦେବ ଦମନ କରେ ଧର୍ମ ବା ନ୍ୟାୟ ଓ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେଛିଲେ । ଦ୍ୱାପର ଯୁଗେ ଇଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନ ସ୍ଵର୍ଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣରୂପେ ନେମେ ଏସେଛିଲେ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବତାର ଇଶ୍ୱରର ଅଞ୍ଚ । ଆର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇଶ୍ୱରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର । ତାଇ ବଳା ହେଉଛେ— ‘କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ୍ ସ୍ଵରମ୍’— ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ଵର୍ଗ ଭଗବାନ ।



ଦେବ-ଦେଵୀ

ଇଶ୍ୱରର କୋନୋ ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତି ଯଥନ ରୂପ ବା ଆକାର ଧାରଣ କରେ ସାକାର ହେଁ ଉଠେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଗୁଣ, ଶକ୍ତି ବା ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରେ ତଥନ ତାକେ ଦେବତା ବା ଦେବ-ଦେଵୀ ବଳେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବ-ଦେଵୀରା ଇଶ୍ୱରର ବିଶେଷ ଗୁଣ ବା ଶକ୍ତିର ସାକାର ରୂପ । ଯେମନ— ବ୍ରାହ୍ମା ସୃତିର ଦେବତା, ବିଷ୍ଣୁ ରୂପେ ଇଶ୍ୱର ଜୀବଜଗତକେ ରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରେନ, ଶିବ ରୂପେ ତିନି ଧର୍ମସ କରେ ପୃଥିବୀର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେନ ।

অপরদিকে দুর্গা শক্তির দেবী, সরঞ্জামী বিদ্যার দেবী, লক্ষ্মী ধন-সম্পদের দেবী ইত্যাদি। যেহেতু দেব-দেবীরা ইশ্বরের অংশ, তাই দেব-দেবীদের সম্মুক্ত করলে ইশ্বর সম্মুক্ত হন।

জীবাত্মা

ইশ্বর যখন জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন, তখন তাকে জীবাত্মা বলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবের মধ্যে ইশ্বরের অবস্থান সম্বর্কে তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন,

‘সীমার মাঝে অসীম ভূমি বাজাও আপন সূর
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।’

অর্থাৎ দেহের সীমায় জীবাত্মারূপে পরমাত্মা বা ইশ্বর বিদ্যমান থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন যে,

ইশ্বর বহুরূপে আমাদের সম্মুখেই আছেন। এ বহুরূপ বলতে জীবকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইশ্বর নিরাকার; কিন্তু তিনি সাকার রূপ ধারণ করতে পারেন। তাঁর সাকার রূপগুলো হচ্ছে— অবতার, দেব-দেবী ও জীব। কিন্তু ইশ্বরের এসকল সাকার রূপ আলাদা কিছু নয়। সব সাকার রূপ একই ইশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ। ইশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।

একক কাজ : ইশ্বরের সাকার রূপের দুইটি গুণ চিহ্নিত কর।

পাঠ ৪ ও ৫ : ইশ্বরের একত্ব

পূর্ববর্তী পাঠসমূহ থেকে আমরা জেনেছি, ইশ্বরের স্বরূপ নানাভাবে প্রকাশিত। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি নিরাকার। তাকে বিভিন্ন ধর্মতের অনুসারীরা নানা নামে অভিহিত করেন। আমরা তাঁর নিরাকার স্বরূপকে ব্রহ্ম বলে থাকি। তিনি ব্রহ্মময় দয়াময় বলে তাকে উগবান বলা হয়। আবার ইশ্বর দুর্মের দমন, শিখের পালন করেন এবং সত্য ও ন্যায়—



নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো-না-কোনো রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তাঁর সেই বিশেষ বিশেষ রূপকে অবতার বলা হয়।

যেমন— শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, মহস্য অবতার প্রভৃতি।

অন্যদিকে, ঈশ্বরের কোনো পুণি বা শক্তি যথন আকার পায় তখন তাঁকে দেবতা বা দেবদেবী বলে। যেমন— ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব— ঈশ্বরের তিনটি প্রধান কর্মের জন্য তিনটি প্রধান রূপ। ব্রহ্মা রূপে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু রূপে পালন করেন এবং শিব রূপে জীব ও জাগতিক বস্তু ধ্বন্স করে ভারসাম্য রক্ষা করেন। দেবী দূর্গা ঈশ্বরের শক্তিরূপ। সরমতী দেবী রূপে ঈশ্বর আমাদের বিদ্যা দান করেন।

তত্ত্বের দেব-দেবীর পূজা করেন। তাঁদের স্তবস্তুতি করে তাঁদের কাছে বিশেষ বিশেষ প্রার্থনা জানান।

এর মধ্য দিয়ে প্রশ্ন জাগে : তাহলে কি ঈশ্বর বহু ? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে : না। তিনি এক ও অবিভািয়। তিনি নিরাকার। আবার তিনিই সাকার। খাগবেদে বলা হয়েছে, ‘একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি’ (১।৬৪।৪৬) এক ব্রহ্মকেই বিপ্রগণ বহু নামে অভিহিত করেছেন। কিংবা ‘একং সন্তৎ বহুধা করয়ন্তি’ (১।১।১৪।৫) এক ঈশ্বরকেই সাধু-সম্মতরা বহু নামে ডাকেন এবং উপাসনা করেন। যেতাবেই উপাসনা করা হোক-না কেন, সবই ঈশ্বরের উপাসনা। সবই তাঁর কাছে পৌছায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে—

১. যারা অন্য দেবতায় ভক্তিমান হয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের পূজা করে, তারা ঈশ্বরেরই পূজা করে। (৯/২৩)
২. ঈশ্বরই সকল যজ্ঞ বা পূজার প্রাপক ও ফলদাতা। (৯/২৪)
৩. যে আমাকে যেতাবে উপাসনা করে, আমি তাকে সেতাবেই সন্তুষ্ট করি। মানুষেরা বিভিন্নভাবে মৃগত আমার পথকেই অনুসরণ করে। (৪/১১)

সূতরাং কেবল হিন্দুধর্মাবলম্বীরা নয়, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা নিজ নিজ মত ও পথ অনুসরে একই ঈশ্বরের উপাসনা করে। এই হলো ঈশ্বরের একত্ব। ঈশ্বর নিরাকার হলোও, তাঁরই ইচ্ছায় সাকার রূপে তাঁর বিচিত্র প্রকাশ।

একক কাজ: ঈশ্বরের একত্ব সম্বর্কে পাঠটি সুন্দর দাও।

পাঠ ৬ : ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোক

বায়ুর্ধমোহন্ত্বিবৃণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিসংহ প্রপিতামহতঃ।
নমো নমস্তেহস্ত সহস্রস্তঃঃ
গুনচ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥১।১।৩৯

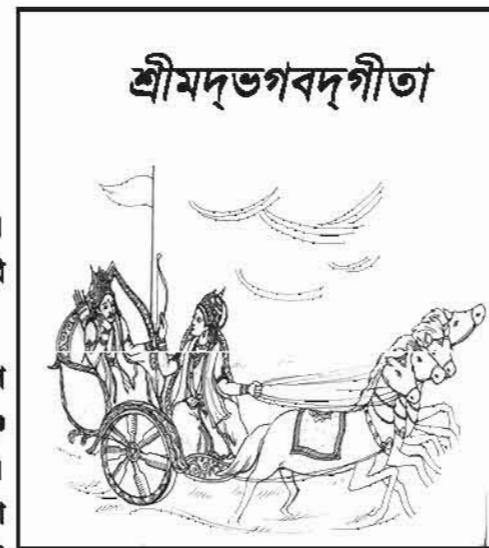
সরলার্থ : ভূমি বায়ু, ভূমি যম, ভূমি অগ্নি, ভূমি বৃক্ষ ও চন্দ্ৰ।

ভূমিই ব্রহ্মা, আবার ব্রহ্মারও দ্রষ্টা ভূমি। তোমাকে নমস্কার করি হাজারবার, বারবার তোমাকে নমস্কার।

ব্যাখ্যা : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপ দর্শন যোগ নামক একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে এ উক্তি করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর। এখানে সেই ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ করা হয়েছে।

যম, অগ্নি, বৃক্ষ, চন্দ্ৰ প্রভৃতি দেবতাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ়হণ করে বলা হয়েছে তাঁরা ঈশ্বরেরই এক-একটি রূপ। তিনিই

সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মা আবার তিনি ব্রহ্মারও দ্রষ্টা। এখানে ঈশ্বরের সৃষ্টি করার শক্তিসহ অসীম শক্তির কথা বলা হয়েছে।



সকল দেবতার শক্তি তাঁরই শক্তি। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি নিরাকার। আবার তিনিই সাকার। এ মহাশক্তিধর অনাদি অনন্ত ঈশ্বরকে তাই বারবার নমস্কার জানিয়ে পরম শৃদ্ধা প্রকাশ করা হয়েছে।

শব্দার্থ :

যম – মৃত্যুর দেবতা। অগ্নি – তেজ-এর দেবতা। বুরুণ – জল ও আকাশের দেবতা। শশাঙ্ক – চাঁদ। প্রজাপতি – ব্রহ্ম। প্রজা-সৃষ্টি। সুতরাং প্রজাপতি বলতে বোঝানো হয়েছে সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মাকে; অর্থাৎ ঈশ্বর যে রূপে সৃষ্টি করেন তাঁর নাম প্রজাপতি। প্রজাপতি ব্রহ্মারই অপর নাম।

প্রপিতামহ – পিতার পিতা= পিতামহ; ব্রহ্মাকে পিতামহ বলা হয়। প্রপিতামহ মানে পিতামহের পিতা। এখানে ঈশ্বরকে পিতামহ অর্থাৎ ব্রহ্মারও পিতা বা দ্রষ্টা বলা হয়েছে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. যিনি সৃষ্টি করেন তিনি।
২. ঈশ্বরের কোনো নেই।
৩. জীবজগতকে রক্ষা ও প্রতিপালনের দেবতা হলেন।
৪. আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এতো।
৫. ত্রেতায়ুগে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. সকল সৃষ্টির পেছনে	অবতার ও দেব-দেবী
২. আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব	বহু নামে অভিহিত করেছেন
৩. ঈশ্বরের সাকার রূপ হলো	উপাসনা করেন
৪. এক ব্রহ্মকেই বিপ্রগণ	অনুভব করি এক অসীম শক্তি বিরাজ করছে

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. ‘সকল সৃষ্টির মূলে ঈশ্বর’ – কথাটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা কর।
২. পৃথিবীতে ঈশ্বর কেন অবতাররূপে আবির্ভূত হন ? ব্যাখ্যা কর।
৩. ‘ঈশ্বর বহুরূপে আমাদের সম্মুখেই আছেন’ – স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিটি দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা কর।
৪. ঈশ্বর সাকার রূপ ধারণ করেন কেন ?

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ইশ্বরের স্বরূপ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
২. ‘সব সাকার রূপ একই ইশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ’ – উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইশ্বর শব্দটির অর্থ কী ?

ক. জ্ঞান	খ. প্রভু
গ. স্তুতি	ঘ. তপস্যা

২. কোনটির আকার আছে ?

ক. বায়ু	খ. আলো
গ. শব্দ	ঘ. গাছপালা

৩. ইশ্বরের পৃথিবীতে অবতাররূপে আবির্জুত হওয়ার কারণ –

- i. দুষ্টের দমন
- ii. জীবের কল্যাণ
- iii. সৌন্দর্য উপভোগ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii	খ) ii ও iii
গ) i ও iii	ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

স্পন্দন প্রতিদিন সকালে এমন একটি গ্রন্থ পাঠ করে বিদ্যালয়ে যায় যেটি উপদেশমূলক এবং যেখানে রয়েছে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির এক অপূর্ব সমষ্টি।

৪. স্পন্দন প্রতিদিন কোন গ্রন্থটি পাঠ করে ?

ক. রামায়ণ	খ. মনসামঙ্গল
গ. শ্রীশ্রীচতুর্ণবী	ঘ. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

৫. উক্ত গ্রন্থ পাঠের ফলে স্পন্দন উপজাতি করতে পারবে –

- i. আত্মা অবিনশ্বর
- ii. কর্ম ত্যাগ নয় আসক্তি ত্যাগ
- iii. ইশ্বরের স্বরূপ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii	খ) ii ও iii
গ) i ও iii	ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। অনিতা রানি গৃহে শিলাদেবীর বিগ্রহ স্থাপন করে নিয়মিত ভক্তিপূর্ণ মনে আরাধনা করেন। কিন্তু তারই প্রতিবেশী শিলাদেবী গৃহে গৌর-নিতাই-এর বিগ্রহ স্থাপন করে নিয়মিত শ্রদ্ধাভরে পূজা করেন। তাদের ছেলেমেয়েরাও লেখাপড়ার পাশাপাশি তাদের অনুকরণ করে। তাদের সৎসারে রয়েছে সদা সুখ ও শান্তি।

- ক. ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার কে ?
- খ. ঈশ্বর কীভাবে জীব ও জগতের ওপর প্রভুত্ব করেন? ব্যাখ্যা কর।
- গ. অনিতা রানি ও শিলাদেবীর আরাধনায় ঈশ্বরের কোন রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে তা তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. অনিতা রানি ও শিলাদেবীর আরাধনায় ‘বিগ্রহের ভিন্নতা থাকলেও মূলত ঈশ্বরেরই পূজা করা হয়’—উক্তিটির মর্মার্থ তোমার পঠিত বিষয়বস্তুর আলোকে বিশ্লেষণ কর।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ଧର୍ମଗ୍ରହଣ

ଧର୍ମଗ୍ରହେ ଧର୍ମର କଥା ଥାକେ, ମାନୁଷେର କଳ୍ୟାଣେର କଥା ଥାକେ । ଈଶ୍ୱରେର ମାହାତ୍ୟ, ଦେବ-ଦେଵୀର ଉପାଖ୍ୟାନ, ସମାଜ ଓ ଜୀବନ ସଙ୍ଗକେ ନାନା ଉପଦେଶମୂଳକ କାହିଁନି ପ୍ରତ୍ଯେ ଧର୍ମଗ୍ରହେର ବିଷୟବସ୍ତୁ । ଧର୍ମଗ୍ରହ ପାଠ କରଲେ ଆମାଦେର କଳ୍ୟାଣ ହୁଏ । ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପୀତା, ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେ ଧର୍ମଗ୍ରହ । ବେଦ ଆମାଦେର ଆଦି ଧର୍ମଗ୍ରହ । ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଥେବେ ଆମରା ସହକ୍ରମେ ପୁରାଣ ଓ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗକେ ଜାନବ ।



ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେବେ ଆମରା –

- ପୁରାଣେର ଅର୍ଥ ଓ ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାଇବ
- ପୁରାଣେର ସଂକଷିତ ପରିଚିତି ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାଇବ
- ମାର୍କଣ୍ଡେ ପୁରାଣେର ଅଂଶ ହିସେବେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରର ପରିଚୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରତେ ପାଇବ
- ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରର ଏକଟି କାହିଁନି ବର୍ଣ୍ଣନା କରତେ ଓ ତାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାଇବ
- ଧର୍ମଚରଣେ ଓ ନୈତିକତାବୋଧେ ପୁରାଣେର ପ୍ରତାବ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରତେ ପାଇବ
- ପୁରାଣେ ବିଧୃତ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମେ ସେ ଜୀବନ ଯାପନେ ଉତ୍ସୁଦ୍ଧ ହବ ।

ପାଠ ୧ : ପୁରାଣ

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର ଉତ୍ସ୍ରୋଧ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଲୋର ମଧ୍ୟେ ପୁରାଣ ଅନ୍ୟତମ । ‘ପୁରାଣ’ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହଚେ ପୁରାତନ ବା ପ୍ରାଚୀନ । କିନ୍ତୁ ଏଥାନେ ପୁରାଣ ଶବ୍ଦଟିକେ ବିଶେଷ ଅର୍ଥେ ବ୍ୟବହାର କରା ହେଁବେ । ପୁରାଣ ହଚେ ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଶ୍ରେଣିର ଧର୍ମଗ୍ରହ । ସେଥାନେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଦେବତାଦେର ଉପାଖ୍ୟାନ, ଧ୍ୟାନ ଓ ରାଜ୍ୟାଦେର ବଂଶ, ପୃଥିବୀର ଭୌଗୋଳିକ ପରିଚିତି, ତୀର୍ଥମାହାତ୍ୟ, ଦାନ, ବ୍ରତ, ତପସ୍ୟା, ଆୟୁର୍ବେଦ (ଚିକିତ୍ସାଶାಸ୍ତ୍ର) ପ୍ରତ୍ୟେତିର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ବେଦତିତ୍ତିକ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଓ ସମାଜେର ନାନା କଥା ବଲା ହେଁବେ । ପୁରାଣ ବଲତେ ଏକଟିମାତ୍ର ଗ୍ରହ ବୋବାଯାଇ ନା । ପୁରାଣ ବହୁ ଗ୍ରହର ସମକ୍ଷି । ସୁତରାଂ ପୁରାଣକେ ଶୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହ ନା ବଲେ ବଲା ଉଚିତ ଗ୍ରହାବଳି ।

মহাভারতের রাচয়িতা মহর্ষি কৃষ্ণচৈপাইন ব্যাসদেব পুরাণসমূহেরও রাচয়িতা। গঙ্গা বলার ছলে পুরাণগুলো রচিত। মানুষ গঙ্গা শুনতে ভালোবাসে। পুরাণে গঙ্গা শোনানো হয়েছে। সে গঙ্গের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মজীবন ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া। মানুষকে কল্যাণকর সুস্মরণ জীবন সম্পর্কে গঙ্গের মাধ্যমে উপদেশ ও নীতি শিক্ষা প্রদান পুরাণের মূল বিষয়বস্তু। পুরাণের সংখ্যা অনেক। তবে প্রধান প্রধান পুরাণের সংখ্যা আঠার। এই আঠারটি পুরাণ হচ্ছে – (১) ব্ৰহ্ম পুরাণ (২) পতঃ পুরাণ (৩) বিষ্ণু পুরাণ (৪) শিব পুরাণ বা বায়ু পুরাণ (৫) ভাগবত পুরাণ (৬) নারদ পুরাণ (৭) মাৰ্কণ্ডেয় পুরাণ (৮) অঞ্চ পুরাণ (৯) ভবিষ্যৎ পুরাণ (১০) ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত পুরাণ (১১) বৰাহ পুরাণ (১২) লিঙ্গ পুরাণ (১৩) স্কন্দ পুরাণ (১৪) বামন পুরাণ (১৫) কূর্ম পুরাণ (১৬) মৎস্য পুরাণ (১৭) গুরুত্ব পুরাণ (১৮) ব্ৰহ্মাণ্ড পুরাণ। এ পুরাণগুলো অনুসরণে কিছু উপ-পুরাণও রচিত হয়েছে। যেমন – বিষ্ণু ধর্মোন্তর পুরাণ। পুরাণের মধ্যে তিনজন দেবতার মাহাত্ম্য বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এরা হলেন – ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিব।

একক কাজ : পুরাণসমূহের নাম লেখ।

নতুন শব্দ : মাৰ্কণ্ডেয়, ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত, বৰাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, গুরুত্ব।

পাঠ ২ : পুরাণের বিষয়বস্তু

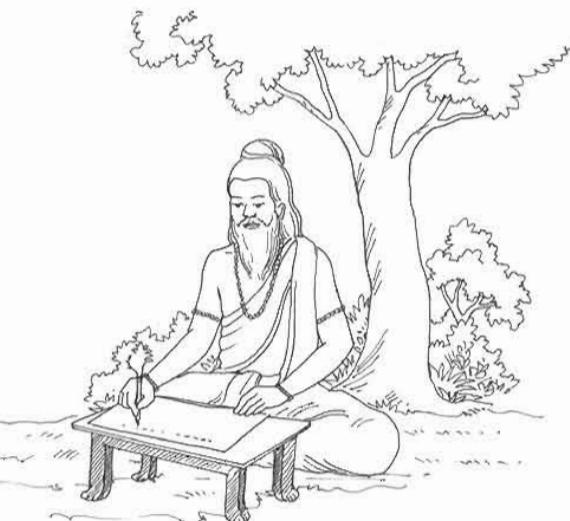
পুরাণ নানা বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। শাস্ত্র পুরাণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে –

সর্গস্ত প্রতিসর্গস্ত বৎসো মন্ত্রান্তরাণি চ।

বৎসানুচরিতাক্ষৈব পুরাণং পঞ্জস্কলম্ ॥ (বায়ুপুরাণ)

অর্ধাত পুরাণের গীচটি বৈশিষ্ট্য – সর্গ, প্রতিসর্গ, বৎস, মন্ত্রস্তর ও বৎসানুচরিত। সর্গ মানে সৃষ্টি। কীভাবে জীব জগতের সৃষ্টি হলো, গঙ্গের আকারে তা পুরাণে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিসর্গ মানে পুনৰায় সৃষ্টি। জীব জগতের সবকিছুর বিলাশ হওয়ার পর আবার নতুন করে সবকিছু সৃষ্টি হয়। একেই বলে প্রতিসর্গ। দেবতা ও ঋষিদের বর্ণনাই হলো বৎস। একেকবার সৃষ্টির পর তা ধূমস হয় এবং তার ছলে নতুন ‘সৃষ্টি’ জেগে উঠে। প্রতিটি সৃষ্টির আদি পুরুষ হলেন মনু।

এভাবে চৌদ্দজন মনুর কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। এক মনু থেকে আরেক মনুর কালের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে বলা হয় মন্ত্রস্তর। আর বৎসানুচরিত হচ্ছে দেবতা, ঋষি বা বিদ্যাত রাজাদের জীবনচরিত। এ ছাড়া পুরাণে রয়েছে বৰ্ণাশ্রম ধর্ম, আচার অনুষ্ঠান, ধার্ম, দান, পূজা, ব্ৰত ও তীর্থস্থানের বৰ্ণনাসহ অনেক বিষয়। মোটকথা, পুরাণের মধ্যে সেকালের ধর্ম এবং জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। আমাদের ধর্ম এবং জীবনে পুরাণের গুরুত্ব অপরিসীম। কত গঙ্গা, কত উপদেশ, জীবনের উথান ও পতনের কত কথা যে পুরাণে রয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না।



ଏକକ କାଜ : ପୁରାଣେ ବିଷୟବସ୍ତୁସମ୍ବୂହ ଚିହ୍ନିତ କର ।

ନତୁନ ଶବ୍ଦ : ସର୍ଗ, ପ୍ରତିସର୍ଗ, ମସ୍ତର, ବର୍ଣ୍ଣନମ ।

ପାଠ ୩ : ଧର୍ମଚରଣ ଓ ନୈତିକଭାବୀ ପୁରାଣ

ଆମାଦେର ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନେ ପୁରାଣେର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅପରିସୀମ । ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟେ ପୁରାଣଗୁଲୋ ଧର୍ମଶାস୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଯ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ । ପୌରାଣିକ ଧର୍ମତେ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, କ୍ଷମା, ଶାନ୍ତି ଓ ତ୍ୟାଗ ମାନୁଷକେ ପ୍ରେସ୍ତତମ ଆସନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେ । ଆର ଏସବ ଗୁଣକେ ଉପଜୀବ୍ୟ କରେଇ ନାନା ଗଙ୍ଗ, ଉପାଖ୍ୟାନେର ମାଧ୍ୟମେ ଜୀବନକେ ସୁନ୍ଦର କରାର ଉପଦେଶାବଳୀ ରହେଛେ ପୁରାଣଶାස୍ତ୍ର । ମେ ସମସ୍ତ ଉପଦେଶ ଆମାଦେର ନୀତିବୋଧକେ ଜାଗାତ କରେ । ଧର୍ମର ପଥେ ଚଲତେ ସହାୟତା କରେ । ସବସମୟ ଈଶ୍ୱରକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରା ଆମଦେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ତାହଲେ ପାପ ଆମଦେର ସର୍ପ କରତେ ପାରିବେ ନା । ପୁଣ୍ୟପଥେ ଥାକଣେ ମୃତ୍ୟୁର ପର ଆମରା ସର୍ବେର ବିଷ୍ଵଳୋକେ ଗମନ କରତେ ପାରିବ । ଚିରତନ ବୈଦିକ ଆଦର୍ଶ, ଏକେଶ୍ୱରବାଦ, ଶୌକିକ ଆଚାରନିଷ୍ଠା, ଜାତିଭେଦେର ସହକାର ଥେବେ ମୁକ୍ତି ଥର୍ଭତି ପୁରାଣେ ଆଲୋଚନା କରା ହଯେଛେ । ଦକ୍ଷବଜ୍ଞ, ଅଶ୍ଵମେଧ ବଜ୍ଞ, ମହିବାସୁର ବଧ ସହ କତ ବର୍ଣ୍ଣା ଜୀବନେର ଉଥାନ-ପତନେର କର୍ତ୍ତା ଯେ ପୁରାଣେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହେଛେ ତା ବଲେ ଶେଷ କରା ଯାଇ ନା । ମେସବ ବୀରଭୂତି କାହିଁନି ଆମାଦେର ଜୀବନକେ ସୁନ୍ଦର ଓ ପରିପାଟି କରେ ଗଡ଼େ ତୁଳତେ ଅନୁଷ୍ଠରଣୀ ଦେଇ ।

ଏକକ କାଜ : ପୁରାଣେ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମେ ଜୀବନକେ ସୁନ୍ଦରଭାବେ ଗଡ଼େ ତୁଳତେ କୀ କୀ ପଦକ୍ଷେପ ଲେବେ ।

ନତୁନ ଶବ୍ଦ : ଚିରତନ, ଏକେଶ୍ୱରବାଦ, ଦକ୍ଷବଜ୍ଞ, ଅଶ୍ଵମେଧ, ବର୍ଣ୍ଣା ।

ପାଠ ୪ : ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ହିନ୍ଦୁଧର୍ମବଳଶ୍ରୀଦେର ଏକଟି ଉତ୍ୱେଖ୍ୟୋଗ୍ୟ ଶତ । ଏଟି ସତତ୍ତ୍ଵଭାବେ ରଚିତ ହେଲି । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ହଜେ ମାର୍କଣ୍ଡେ ପୁରାଣେର ଏକଟି ଅଂଶ । ମାର୍କଣ୍ଡେ ପୁରାଣେର ୮୩ ଥେବେ ୯୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩୩ ଅଧ୍ୟାତ୍ମର ନାମ ଚଣ୍ଡି । ମାର୍କଣ୍ଡେ ପୁରାଣେର ଏ ଅଂଶଟିର ନାମ ହିଂସ ଦେବୀମାହାତ୍ୟ । ଚଣ୍ଡିତେ ସାତଶତ ମତ୍ତ ଆହେ, ତାଇ ଏଇ ଆରେକ ନାମ ସନ୍ତଶତି । ମହାଭାରତେ ଅଂଶ ହେଁବେ ଗୀତା ଯେମନ ପୃଥିକ ଗ୍ରହେର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପେଇୟେ, ତେମନି ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମାର୍କଣ୍ଡେ ପୁରାଣେର ଅଂଶ ହେଁବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ରଚନାର ଗୁଣେ ଆଲାଦା ଗ୍ରହେର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପେଇୟେ । ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରିତେ ରାଜ୍ଞୀ ସୁରଥ ଓ ସମାଧି ବୈଶ୍ୟେର କାହିଁନି, ଦେବୀ ମହାମାୟା, ଦେବୀ ଦୂର୍ଗା, ଦେବୀ ଅଧିକା ଓ ଦେବୀ କଲିକାର ଉତ୍ସବ ଓ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଁବେ । ଦୂର୍ଗାପୂଜା ଓ ବାସତ୍ତ୍ଵ ପୂଜାର ସମୟ ବିଶେଷଭାବେ ଚଣ୍ଡି ପାଠ କରା ହୁଏ । ଗୀତାର ମତୋ ଚଣ୍ଡିଓ ଏକଟି ନିତ୍ୟପାଠ୍ୟ ଶତ ।



ପୁରାଣ ମତେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ରାଜ୍ଞୀ ସୁରଥ ବସନ୍ତକାଳେ ଦେବୀର ଆରାଧନା ଶୁଭ୍ୟ କରେନ । ଏଜନ୍ୟ ଏ ପୂଜାର ନାମ ହୁଏ ବାସତ୍ତ୍ଵପୂଜା । ବର୍ତ୍ତମାନେ ଶରତକାଳେ ଯେ ଦୂର୍ଗାପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରା ହୁଏ ଏଟି ମୂଳତ ଅକାଲ ବୋଧନ । ଅପରାତ ଶୀତାକେ ଉତ୍ସବର କରତେ ରାବନେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ କରାର ଆଗେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶରତକାଳେ ଏ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଇଲେ । କାଳକ୍ରମେ ଶରତେର ଏ ପୂଜାଇ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଞ୍ଚେ ଏବଂ ଶାରଦୀୟ ଦୂର୍ଗାତ୍ସବ ନାମେ ପରିଚିତି ଲାଭ କରେଛେ । ଶରତେର ଆଗମନୀବାର୍ତ୍ତା ନିଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପଦାର୍ପଣ କରେନ ଦେବୀ ଦୂର୍ଗା । ଶୁଭ୍ୟପକ୍ଷେର ସତ୍ତ୍ଵ, ସମ୍ଭାବୀ, ଅନ୍ତମୀ, ନବମୀ ତିଥିତେ ଦେବୀ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ ଆମାଦେର ପୃଥିବୀତେ ।

ଦଶୀଯ କାଜ : ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର କରେକଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ।

ନୃତ୍ୟ ଶବ୍ଦ : ବୋଧନ, ଚରିତ ।

ପାଠ ୫ : ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜାର ମହାତ୍ୟ

ପୂରାକାଳେ ଚୈତ୍ର ବହୁଥ ସୁରଥ ନାମେ ଏକ ରାଜ୍ଞୀ ଛିଲେନ । ଏକବାର ତିନି ଶତ୍ରୁ ଘାରା ଆକ୍ରମିତ ହେଁ ରାଜ୍ୟଚୂଡି ହନ । ତଥନ ରାଜ୍ଞୀ ସୁରଥ ରାଜ୍ୟ ଛେଡ଼ ବନେ ବନେ ଘୁରେ ବେଡ଼ାତେ ଲାଗିଲେନ । ଘୁରତେ ଘୁରତେ ତିନି ମେଧା ନାମେ ଏକ ମୁନିର ଆଖମେ ଏଲେନ । ତୀର ମନେ ଜେଗେ ରାଇସ ହାରାନୋ ରାଜ୍ୟର ଜନ୍ୟ ଦୁଃଖବୋଧ ଆର ପ୍ରଜାଦେର ଜନ୍ୟ ମମତା । ଏକଇ ସମୟେ ସେଇ ବନେ ଏଲେନ ସମାଧି ନାମକ ଏକ ବୈଶ୍ୟ । ବ୍ୟବସା କରେ ତିନି ଥିରୁ ଧନସମ୍ପଦ କରେଛେ । କିନ୍ତୁ ତୀର ଜ୍ଞୀ ଓ ପୁତ୍ରଗଣ ତା ଅସଂ ପଥେ ବ୍ୟା କରାତେ ଚାନ୍ଦ । ତିନି ବାଧା ଦିଯେଛେ ବଲେ ତୀର ଜ୍ଞୀ ଓ ପୁତ୍ରରା ତାକେ ଅପମାନ କରେଛେ । ତିନି ମନେର ଦୁଃଖେ ବନେ ଚଲେ ଏମେହେନ । କିନ୍ତୁ ତାକେ ଯାରା ଅପମାନ କରେଛେ, କହୁ ଦିଯେଛେ, ତିନି ତାଦେର ଭୁଲାତେ ପାରହେନ ନା । ସମୋର ଛେଡ଼ ଏମେତେ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ତୀର ଖୁବ କହୁ ହାହେ । କେମ ଏଇ କହୁ, କେମ ଏଇ ଅନ୍ତରେର ଟାନ ?

ରାଜ୍ଞୀ ସୁରଥ ଏବଂ ସମାଧି ବୈଶ୍ୟ ଦୁଃଖନେ ଦୁଃଖନେର ମନେର କଥା ଜାନିଲେନ । ଦୁଃଖନେଇ ସମବ୍ୟଥି । ଦୁଃଖନେ ଏକସାଥେ ଗେଲେନ ମେଧା ମୁନିର କାହେ । ଜିଜେଲ୍ କରିଲେନ, କେମ ଏମନ ହୁଁ ? ତଥନ ମୁନି ବଲିଲେନ, ଏଠା ଜଗତରେଇ ନିଯମ । ଏର ନାମ ଯାଇ । ଆର ଏହି ମାଯା ମହାମାୟାର ପ୍ରଭାବ । ତବେ ପ୍ରସନ୍ନ ହଲେ ମହାମାୟା ମାନୁଷେର ମଞ୍ଜଳ କରେନ ଏବଂ ମୁକ୍ତିଓ ପ୍ରଦାନ କରେନ ।



ରାଜ୍ଞୀ ସୁରଥ ତଥନ ମହର୍ଷି ମେଧାର କାହେ ଜାନାତେ ଚାନ, କେ ଏହି ମହାମାୟା, କୀ ତୀର ସ୍ଵରୂପ ? ମେଧା ବଣାତେ ଲାଗିଲେନ, ଏହି ଜଗାଏ ମହାମାୟାର ମୂର୍ତ୍ତି ହଲେବ ତିନି ନିତ୍ୟ, ତିନି ଚିରଭନ୍ଦ । ତୀର ଧବଳ ନେଇ । ତିନି ଆମାଦେର ସକଳ ବିପଦ ଥେକେ ରଙ୍ଗା କରେନ । ମେଧା ମୁନି ଆରଓ ବଲେନ ଯେ, ଏକଇ ଦେବୀ ମହାମାୟା, ଦୂର୍ଗା, ଅମିକା ଓ କାଲିକା ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଁଲେନ । ଅସୁର ବା ଦୈତ୍ୟଦେର ବିନାଶ କରେ ଶାନ୍ତି ହାପନ କରେଲେନ । ଦେବତାରା ତାକେ ମୁହଁ କରେ ଶନ୍ତା ଜାନିଯେଲେନ । ରାଜ୍ଞୀ ସୁରଥ ଓ ସମାଧି ବୈଶ୍ୟ ମେଧା ମୁନିର କାହେ ଥେକେ ଦେବୀର ଏ ମହାତ୍ୟ ଓ ଦେବୀର ପୂଜାପର୍ଵତି ଶିଖେ ନେନ । ଏଇପରି ତାରା ଦୁଃଖନେ ମିଳେ ଦେବୀର ମୂଳଗୀ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରେ ପୂଜା କରାତେ ଥାକେନ । ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହନ । ଦେବୀର କୃପାୟ ରାଜ୍ଞୀ ସୁରଥ ତାର ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବେ ପାଇ । ଆର ସମାଧି ବୈଶ୍ୟ ଦେବୀର କାହେ କିନ୍ତୁଇ ଚାନ ନା । ଧନସମ୍ପଦେର ମୋହ ତୀର ଦୂର ହେଁ ଗେଛେ । ତିନି ଚାନ ଦୁଃଖ ଥେକେ ମୁକ୍ତି, ଚାନ ଅନ୍ତରେର ଶକ୍ତି । ଦେବୀର କୃପାୟ ସମାଧି ବୈଶ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତି ଶାତ କରେନ ।

ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେରୁ ଶକ୍ତିରୂପେ ସଥିତିତା ।

ନମସ୍ତୈସ୍ୟ ନମସ୍ତୈସ୍ୟ ନମସ୍ତୈସ୍ୟ ନମୋ ନମଃ ॥ (ଚନ୍ଦ୍ରି ୫ / ୩୨,୩୩,୪ ୩୪)

ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଦେବୀ ସକଳ ଜୀବେ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଅର୍ଥିତା, ତାକେ ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର ।

ଏକକ କାଙ୍ଗ : ରାଜ୍ଞୀ ସୁରଥ ଏବଂ ସମାଧି ବୈଶ୍ୟ ଯେ କାରଣେ ସର ଛେଡ଼ିଛେ କେ କାରଣଗୁଲୋ ଚିହ୍ନିତ କର ।

ନତୁନ ଶବ୍ଦ : ପ୍ରସନ୍ନ, ମାର୍ଯ୍ୟା, ଚିରନ୍ତନୀ ।

ପାଠ ୬ : ମହିଷାସୁର ବଧ

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚର୍ମୀ ବା ମହାମାଯା ଦେବତାସହ ମାନବକୁଳକେ ତିନି ଦେବତାଦେର ନାନା ବିପଦ ଥେକେ ରଙ୍ଗା କରେନ ।

ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଏକଟି କାହିନୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ହଲୋ । ବହୁକାଳ ପୂର୍ବେ ଦେବତା ଓ ଅସୁରଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକବାର ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ଥାଏ । ତଥନ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ଦୈତ୍ୟରାଜ ମହିଷାସୁର । ଦାନବେରୀ ଦେବତାଦେର ପରାଜିତ କରିଲ । ମହିଷାସୁରର ଖୁବ ଆନନ୍ଦ । ବମ୍ବ ସର୍ଗେର ସିଂହାସନେ ।

ଶର୍ଗହାରୀ ଦେବତାରୀ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରେର ନେତୃତ୍ବେ ପ୍ରଥମେ ଗେଲେନ ବ୍ରହ୍ମାର କାହେ । ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାଦେର ଦୁଃଖେର କଥା ଶୁଣିଲେ । ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବ ଯେଥାନେ ବସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଲଛେନ, ଯେଥାନେ ଗିଯେ ଉତ୍ସବକେ ବନ୍ଦନା କରେ ଦେବତାଦେର ଦୁଃଖେର କଥା ଜ୍ଞାନାଲେନ । ବ୍ରହ୍ମାର ଯୁଦ୍ଧେ ଏମନ ଯର୍ମାନ୍ତିକ କଥା ଶୁଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଆର ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟଥିତ ହଲେନ, ତାରପର ତୁଳ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଲେନ । ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାଦେର ଶରୀର ଥେକେ ଭୟଜକ ତେଜ ବେର ହଲୋ । ସେଇ ତେଜ ଏକପାଇଁ ହରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ନାରୀମୂର୍ତ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ହଲୋ । ଇନିଇ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା । ତାରପର ଦେବଗଣ ତାକେ ନାନାନ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଅଳ୍ପକାର ଦାନ କରିଲେନ । ଏତାବେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଅପୂର୍ବ ସାଜେ ସେଜେ ଉଠିଲେନ । ତଥନ ଗିରିରାଜ ହିମାଲୟ ଦେବୀର ବାହନେର ଜନ୍ୟ ଦିଲେନ ସିଂହ । ଦେବତାଗଣ ଆନନ୍ଦେ ଜୟଧବନି ଦିଲେନ, ମୁନିରା ଦେବୀତବ କରିଲେନ । ଅସୁରରା ଦେବୀର ସେଇ ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନ ଶୁଣେ ତୌର ଅଭିମୁଖେ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଦ୍ରୁତବେଗେ ଚଲାନ । ତାରପର ଶୁଣୁ ହଲୋ ଦେବତା ଓ ଅସୁରଦେର ମଧ୍ୟେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ । ମହିଷାସୁରର ସେନାପତି ଚିକ୍ର ଓ ଚାମରସହ ଚତୁରଜ୍ଞ ସେନା ନିଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲେ ଲାଗଲ । ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା କିନ୍ତୁ ଏକା । ତାତେ କୀ ? ରାଗେ ମତ୍ତ ମହାଶକ୍ତିମାନ ଦେବୀର ନିଃଶ୍ଵାସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଲୋ । ତଥନ ଏକେ ଏକେ ଚିକ୍ର, ଚାମରସହ ପ୍ରାୟ ସକଳେଇ ଦେବୀର ଅନ୍ତରାଘାତେ ନିହତ ହଲୋ । ତାରପର ଯୁଦ୍ଧେ ନାମେନ ମହିଷାସୁର ନିଜେ । ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଆର ମହିଷାସୁରର ମଧ୍ୟେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଁ । ଅବଶେଷେ ଦେବୀ ଶୁଳାଘାତେ ମହିଷାସୁରକେ ବଧ କରେନ । ଦେବତାରା ତାଦେର ସର୍ଗରାଜ୍ୟ ଆବାର କିମ୍ବା ପାଇ ।



একক কাজ : মহিযাসুর বধ কাহিনীর শিক্ষা চিহ্নিত করে তোমার প্রাত্যাহিক জীবনে তার প্রভাব বর্ণনা কর।

নতুন শব্দ : ব্রহ্মালোক, বুদ্ধমূর্তি, চতুরঙ্গা, গিরিরাজ।

পাঠ ৭ : শৃষ্টি-নিষ্ঠুর বধ

আরেকবার শৃষ্টি নামের এক অসুর দেবতাদের পরাজিত করে শর্গ দখল করে নেয়। সে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের অধীনের হয়ে বসে। তার ভাই নিশুষ্ঠ, সেনাপতি চঙ্গ, মুণ্ড, রক্তবীজ প্রতিষ্ঠা করে তাসের রাজত্ব। আবার দেবতারা দেবীর স্তব করে দেবীকে প্রসন্ন করেন। এবার দেবীর ক্ষেত্র থেকে আবির্জুত হন দেবী অধিকা। ফলে তাঁর শরীর কালো হয়ে যায়। তিনি পরিচিত হন কালিকা নামে। এই কালিকা বা অধিকার কাছে শৃষ্টি, নিষ্ঠুর, রক্তবীজ, চঙ্গ ও মুণ্ড পরাজিত ও নিহত হয়।

দেবতারা পুনরায় স্বর্গরাজ্য ফিরে পান। এভাবে শুধু স্বর্গের দেবতাদেরই নয়, সমগ্র জীব-জগতের কল্যাণ সাধন করেন মহাদেবী মহামায়া।



দলীল কাজ : কালিকা বা অধিকার হাতে নিহত অসুরদের একটি ভাষিকা তৈরি কর।

নতুন শব্দ : অধীশ্বর, ত্রাস, অবিকা, কালিকা, রক্তবীজ।

পাঠ ৮ : শ্রীশ্রীচতুর্ণির শিক্ষা

শ্রীশ্রীচতুর্ণির প্রথম চরিতে শ্রীবিষ্ণু মধু-ক্ষেত্রকে বধ করে শান্তি স্থাপন করেছেন। মধ্যম চরিতে দেবতাদের তেজ থেকে সৃষ্টি দেবীদুর্গা মহিযাসুরসহ অসুরদের হত্যা করেছেন। দেবতারা ফিরে পেয়েছেন তাঁদের স্বর্গরাজ্য। উত্তর চরিতে শৃষ্টি নিষ্ঠুরসহ অসুরদের বধ করেছেন দেবী অশ্বিকা বা দেবী কালিকা। দেবী দুর্গা ঈশ্বরের শক্তির প্রতীক। উত্তৃথিত এ কাহিনি দৃঢ় থেকে আমরা বেশ কয়েকটি শিক্ষা পাই।

শ্রীশ্রীচতুর্ণি আমদের শক্তি ও সাহস যোগান। দেবী দুর্গা অন্যায়কে দমন করেছেন। শ্রীশ্রীচতুর্ণির এই শিক্ষা অনুকরণ করে আমরাও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুঝে দাঢ়াব। শৰ্গচূড় দেবতাগণের ঐকাই তাঁদের আবার স্বর্গ ফিরিয়ে দিয়েছে। দেবতাদের সম্মিলিত তেজ বা শক্তিই হচ্ছে মহামায়া শ্রীশ্রীচতুর্ণি। এখানে একতাই শক্তির প্রমাণ মেলে। পাশাপাশি নারীশক্তির উত্থান ঘটেছে। হিন্দুধর্মে নারীকে বিশেষভাবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। শ্রীশ্রীচতুর্ণি অর্ধাং দেবীদুর্গা মাতৃশক্তিরূপে অধিষ্ঠিত। তিনি নারীশক্তির প্রতীক। মায়ের মতো করুণাময়ী।

শ্রীশ্রীচতুর্ণির মাধ্যমে শত্রুর কক্ষ থেকে দেশ ও সমাজকে রক্ষা করার অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। সকল প্রকার দুঃখ- দুর্গাতির অবসানকলে তাঁর আরাধনা করা হয়। সকল প্রকার দুর্গাতিনশ্চিনী বলেই তিনি শ্রীদুর্গা। দেবীকে আমরা এই বলে প্রণাম করি :

ସର୍ବମଙ୍ଗଳମଙ୍ଗଳ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥସାଧିକେ ।
ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ୟାମ୍ବକେ ଗୌରି ନାରାୟଣ ନମୋହସ୍ତୁ ତେ ॥

‘ତୁମି ସକଳ ପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣଦାୟିନୀ । ତୁମି ମଙ୍ଗଳମଯୀ, ତୁମି ସର୍ବପଥକାର ଅଭୀଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣକାରିଣୀ । ତୁମି ଜଗତେର ଶରଣଭୂତା, ତୁମି ତ୍ରିନୟନା, ତୁମି ଗୌରୀ, ତୁମି ନାରାୟଣୀ । ହେ ଦେବୀ, ତୋମାକେ ପ୍ରଣାମ କରି ।’

ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଶରଣାଗତକେ ରକ୍ଷା କରେନ । ତିନି ସକଳ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରେନ । ଆମରାଓ ଦେବୀର ଏ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରବ । ଶରଣାଗତକେ ରକ୍ଷା କରବ । ଅସହାୟେର ପାଶେ ଗିଯେ ଦୀଢ଼ାବ । ମନେର ଭିତରେ ବସବାସକାରୀ ପଶୁର ଶକ୍ତିକେ ବିନାଶ କରବ । ସମାଜେ ଗଡ଼େ ତୁଳବ ଅନ୍ୟାଯେର ବିରୁଦ୍ଧେ ପ୍ରତିରୋଧ, ଗଡ଼େ ତୁଳବ ଆଦର୍ଶ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ।

ଦଳୀଯ କାଜ : ‘ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରିର ଶିକ୍ଷାଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅସୁରଶକ୍ତିକେ ବିନାଶ କରତେ ପାରେ ।’ ଉଦାହରଣସହ ଯୁକ୍ତି ଦାଓ ।

ନତୁନ ଶବ୍ଦ : ଅଭୀଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣକାରିଣୀ, ଶରଣଭୂତା, ତ୍ରିନୟନ, ଗୌରୀ, ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ।

ଅନୁଶୀଳନୀ

ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରନ :

୧. ପୂରାଣ ଶଦେର ଅର୍ଥ
୨. ଚନ୍ଦ୍ରି ହଞ୍ଚେ ପୂରାଣେର ଏକଟି ଅଂଶବିଶେଷ ।
୩. ବାସନ୍ତୀ ପୂଜାର ସମୟ ପାଠ କରା ହୁଏ ।
୪. ସୁରଥ ବଦ୍ଶେର ରାଜୀ ଛିଲେନ ।
୫. ଯା ଦେବୀ ଶକ୍ତିରୂପେଣ ସଂଖ୍ୟାତା ।

ଡାନ ପାଶ ଥେକେ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ନିୟେ ବାମ ପାଶେର ସାଥେ ମିଳ କରନ :

ବାମ ପାଶ	ଡାନ ପାଶ
୧. ପୂରାଣେ ମାନୁମେର ଜନ୍ୟ	ସମ୍ପତ୍ତତୀ
୨. ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରିର ଅପର ନାମ	ବେଦ
୩. ମହାମାୟା ସକଳକେ	କଲ୍ୟାଣକର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କେ ବଳା ହେଯେଛେ
୪. ଦେବତାଦେର ତେଜେପୁଞ୍ଜ ହତେ	ଏକ ଦିବ୍ୟ ନାରୀମୂର୍ତ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ
୫. ହିନ୍ଦୁଦେର ଆଦି ଧର୍ମଗ୍ରହେର ନାମ ହଞ୍ଚେ	ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ବିପଦ ଥେକେ ରକ୍ଷା କରେନ

ନିଚେର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ସଂକ୍ଷେପେ ଉତ୍ତର ଦାଓ :

୧. ଧର୍ମଗ୍ରହେର ଧାରଣାଟି ଉଦାହରଣସହ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
୨. ପୂରାଣେର ମୂଳ ଶିକ୍ଷା କୀତାବେ କାଜେ ଲାଗାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
୩. ରାଜୀ ସୁରଥ କେନ ରାଜ୍ୟହାରା ହଲେନ ?
୪. ମହିଷାସୁର ବଧେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିଯେ ଲେଖ ।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১. পূরাণ পাঠের আবশ্যকতা ব্যাখ্যা কর।
২. পূরাণ শুধু একটি বিষয় নিয়েই রচিত হয়নি – কথাটি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা কর।
৩. শ্রীশ্রীচতীর শিক্ষা কীভাবে সমাজের মজলের জন্য ব্যবহার করা যায় – বুঝিয়ে লেখ।
৪. শ্রীশ্রীচতীর পাঠের মাহাত্ম্য সমাজ জীবনের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পূরাণের প্রধান বৈশিষ্ট্য কয়টি ?
 ক. পীচ খ. বার
 গ. আঠার ঘ. একুশ
২. স্বর্গ কথাটির অর্থ কী ?
 ক. সুখ খ. শান্তি
 গ. পুণ্য ঘ. সৃষ্টি
৩. ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত হয় –
 i. ঈশ্঵রের বাণী ও মাহাত্ম্য
 ii. সমাজ জীবনের জন্য মজলজনক উপদেশ
 iii. দেবদেবীর কাহিনী

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সৌমি প্রতিদিন শ্রীশ্রীচতী পাঠ করে। এতে সারাদিন তার মন ভালো থাকে। তাছাড়া সে মনে করে চতী পাঠ করার ফলে তার ও পরিবারের মজল হয়।

৪. সৌমির পঠিত গ্রন্থে কার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে ?
 ক. দুর্গা খ. লক্ষ্মী
 গ. সরস্বতী ঘ. শীতলা
৫. সৌমি প্রতিদিন শ্রীশ্রীচতী পাঠ করে। কারণ এর মাধ্যমে –
 i. ঈশ্বরভক্তির নির্দর্শন রয়েছে
 ii. বিপদ থেকে পরিত্রাণের পথপ্রদর্শক
 iii. ধর্ম রক্ষিত হয়।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

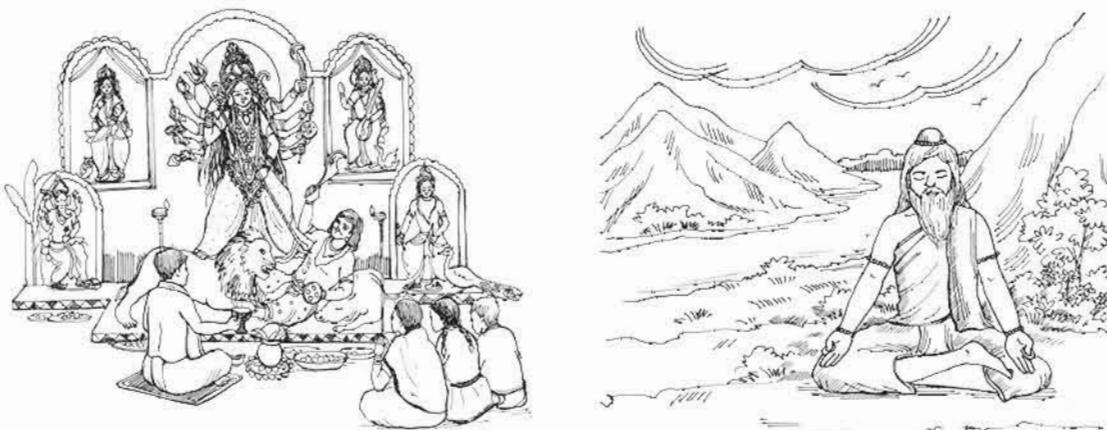
১। সঞ্জয় দুর্ধর্ষ ও নিষ্ঠার প্রকৃতির হলেও সন্তানবৎসল। সে সামান্য ব্যাপারেই রাগাশ্঵িত হয়ে তুলকালাম কাউ বাধায়। শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। তার স্বার্থে আঘাত লাগলে মারধর পর্যন্ত করে। অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ কেড়ে নেয়। এসকল কারণে সকলেই তাকে অপছন্দ করে। অথচ প্রচুর দানধ্যান করে বলে তাকে ত্যাগ করতে পারে না। তারই ছেলে দেবজিৎ আবার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে অমায়িক ও দয়ালু এবং পরোপকার ও সমাজসেবামূলক কাজ করতে ভালোবাসে। দেবজিৎ বাবার অনৈতিক কর্মকাণ্ড একেবারেই পছন্দ করে না। অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ করে বলে প্রায়ই বাবার সাথে দম্পত্তি হয়।

- ক. শ্রীশ্রীচতুর্ণীতে কতগুলো মন্ত্র আছে?
- খ. শ্রীশ্রীচতুর্ণী কীভাবে পুরাণের অন্তর্গত?
- গ. সঞ্জয়ের চরিত্রের সাথে মহিষাসুরের চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা কর।
- ঘ. ‘শ্রীশ্রীচতুর্ণীর শিক্ষা দেবজিৎ-এর চরিত্রে অনেকটাই প্রতিফলিত হয়েছে’—কথাটি মূল্যায়ন কর।

তৃতীয় অধ্যায়

হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও বিশ্বাস

হিন্দুধর্ম একটি সুস্থাচীন ধর্ম। এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কোনো একজন মাত্র ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যায় না। বহু সাধকের সাধনায় এ ধর্ম বিকশিত হয়ে চলছে। ইশ্বরের স্বরূপ, তাঁর প্রতি বিশ্বাস, কর্মবাদ, জন্মান্তর, অবতারতত্ত্ব, দেব- দেবীর পূজা, মোক্ষলাভ, নারীর প্রতি মর্যাদাবোধ – এগুলো হিন্দুধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এসকল বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়েই হিন্দুধর্মের স্বরূপ উপস্থিতি ও ব্যাখ্যা করা যায়।



আবার হিন্দুধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা হিন্দুধর্মের ভিত্তিস্বরূপ কঠিপয় বিশ্বাস ও ধর্মকৃত্যের সঙ্গে পরিচিত হই।

এ অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদে যথাক্রমে হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- হিন্দুধর্মের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারব
- হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ইশ্বরতত্ত্ব, ইশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- হিন্দুধর্মের কঠিপয় মৌলিক বিশ্বাসের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব (যেমন—কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ জগতের কল্যাণ এবং মোক্ষ)
- ধর্মকৃত্য হিসেবে উপাসনা পদ্ধতি, পূজা, ধর্মাচার ও সংস্কার ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধর্মবিশ্বাস হিসেবে কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ ধারণা দুটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- কর্মফল ও জন্মান্তর সম্পর্কে একটি ধর্মীয় উপাধ্যান ও তাঁর শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব
- ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে নারীর মর্যাদার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- নারীর মর্যাদা প্রদানে করণীয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব
- কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস রেখে ত্যাগী হয়ে শুভকর্মে গিণ্ড ধাক্কা
- নারীর প্রতি মর্যাদা ও শ্রদ্ধা পোষণ করব।

প্রথম পরিচ্ছেদ : হিন্দুধর্মের স্বরূপ

পাঠ ১ : হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলো তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। হিন্দুধর্মেরও বিশেষ তত্ত্ব, কতগুলো ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মকৃত্য রয়েছে, যেগুলো হিন্দুধর্মের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যেমন— ঈশ্঵রতত্ত্ব, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি, কর্মবাদ ও জন্মাত্ত্ব, অবতারবাদ, মোক্ষলাভ, জীব ও জগতের কল্যাণভাবনা ইত্যাদি। আর এ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে হিন্দুধর্মের স্বরূপ। এখন হিন্দুধর্মের স্বরূপ প্রকাশক প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে জানব।

ঈশ্বরতত্ত্ব

হিন্দুধর্মে ঈশ্বরকে নিরাকার বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি এক এবং অবিভািয়— এ বিষয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করা হয়েছে। আমরা জানি, নিরাকার ঈশ্বরকে বলা হয় ব্ৰহ্ম, যখন প্ৰভুত্ব কৱেন তখন তিনি ঈশ্বৰ। জীবকে যখন কৃপা কৱেন তখন তাকে বলা হয় ভগবান।

হিন্দুধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, নিরাকার ঈশ্বর প্ৰয়োজনে সাকার রূপ ধারণ কৱতে পাৱেন। সাকার রূপ ধারণ কৱে পৃথিবীতে নেমে আসতে পাৱেন। আমরা জানি, ঈশ্বর এভাবে নেমে আসলে তাকে অবতার বলে। এ অবতারবাদ হিন্দুধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আবার ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তি আকার পেলে তার নাম দেব-দেবী। এ দেববাদও হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

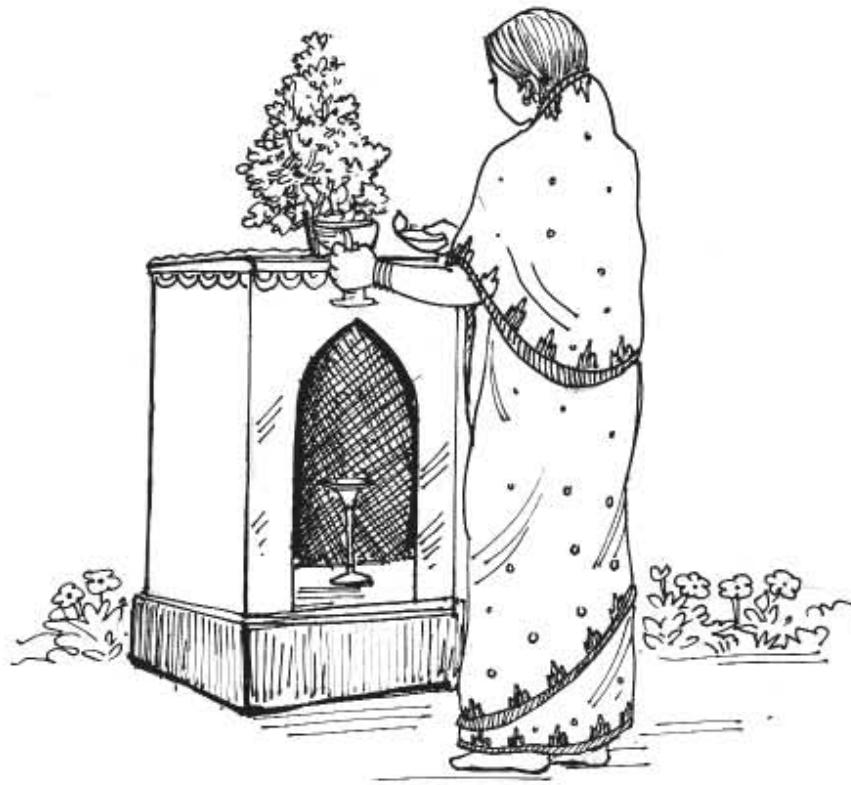
আমরা জানি, জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর অবস্থান কৱেন। তাই জীবমাত্ৰই শ্ৰদ্ধেয় এবং তার সেবা কৱতে হয়। কাৰণ জীবসেবা যে ঈশ্বরের সেবা। আৱ এখানেই রয়েছে হিন্দুধর্মের নৈতিক শিক্ষার মূলভিত্তি। জীবকে ঈশ্বরজ্ঞান কৱলে আৱ কোনো দৰ্শ-সংঘাত বা হানাহানিৰ প্ৰশঁই ওঠে না। জীবকে কষ্ট দেওয়াৰ প্ৰশঁও ওঠে না। কাৰণ জীবকে কষ্ট দেওয়া মানেই ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া।

হিন্দুধর্ম অনুসারে ব্ৰহ্ম বা ঈশ্বৰ, অবতাৱ, দেব-দেবী এবং জীব— সব মিলিয়ে এক ঈশ্বৰ। এই হলো হিন্দুধর্মের ঈশ্বৰতত্ত্ব।

একক কাজ : তোমাৱ জানা একজন ব্যক্তিৰ জীবসেবামূলক কৰ্মকাণ্ড বৰ্ণনা কৰ।

পাঠ ২ ও ৩ : ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি

হিন্দুধর্মের অনুসারীরা ঈশ্বরে গভীরতাবে বিশ্বাস করেন। তাঁরই নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করে বিশ্বসংসার চলছে। তিনি সৃষ্টি, ছিতি ও বিনাশের সর্বময় কর্তা। তিনি পরম দয়ালু—পরম করুণাময়। তাই তাঁকে ভক্তি করা কর্তব্য। দেব-দেবীরাও ঈশ্বরের অংশ। তাই তাঁদেরও ভক্তি করা হয়।



কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। সকল কিছুর পরিচালক তিনি। জীবের জীবিকা অর্জনের জন্য কর্মও তিনি সৃষ্টি করেছেন। আমরা যা কিছু করি, সে সবই কর্ম। ঘৰ-বাড়ি তৈরি করা, ফসল উৎপাদন করা, ব্যবসা-বাণিজ্য করা, লেখাপড়া করা, পূজা-অর্চনা, ধ্যান-ধারণা সবই কর্মের মধ্যে পড়ে। প্রত্যেক কর্মেরই ফল আছে। শুভ কর্মের ফল শুভ বা পুণ্য আবার অশুভ কর্মের ফল অশুভ বা পাপ। এই কর্মফল কিন্তু কর্মকর্তাকে অবশ্যই তোগ করতে হয়। তোগ ছাড়া কোনো কর্মফল নষ্ট হয় না। এটাই কর্মবাদ। এই কর্মফল তোগের জন্য প্রয়োজনে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। একে বলা হয় জন্মান্তর। এই কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্মের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মোক্ষলাভ

হিন্দুধর্মের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মোক্ষলাভ। ‘মোক্ষ’ কথাটির মানে হচ্ছে চিরমুক্তি লাভ। কোথা থেকে মুক্তি? বারবার জন্ম ও মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি। জীবের আআ ঈশ্বর বা পরমাত্মার অংশ। চিরমুক্তি লাভ করে জীবাত্মা ঈশ্বর বা পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যায়। তখন আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। একেই বলে মোক্ষ।

ମୋକ୍ଷ ଲାଭେର ଉପାୟ ହଚ୍ଛେ ସକଳ କର୍ମ ଈଶ୍ୱରେ ସମର୍ପଣ କରା । ଅର୍ଥାଏ ସକଳ କାଜ ଈଶ୍ୱରେର କାଜ ମନେ କରେ ସମ୍ମାଦନ କରା, ଭୋଗେର ଆକାଙ୍କ୍ଷା ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ତ୍ୟାଗ-ତିତିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଜୀବନ ଯାପନ କରା ଏବଂ ଜୀବ ଓ ଜୀବତେର ଜନ୍ୟ କଳ୍ୟାଣକର କାଜ କରେ ଯାଓଯା ।

ଏକକ କାଜ : କର୍ମବାଦ ଧାରାଣ୍ଟି କରେକଟି ଉଦାହରଣ ଦିଯେ ବୁଝିଯେ ଦେଖ ।

ପାଠ ୪ ଓ ୫ : ଜୀବ ଓ ଜୀବତେର କଳ୍ୟାଣଭାବନା

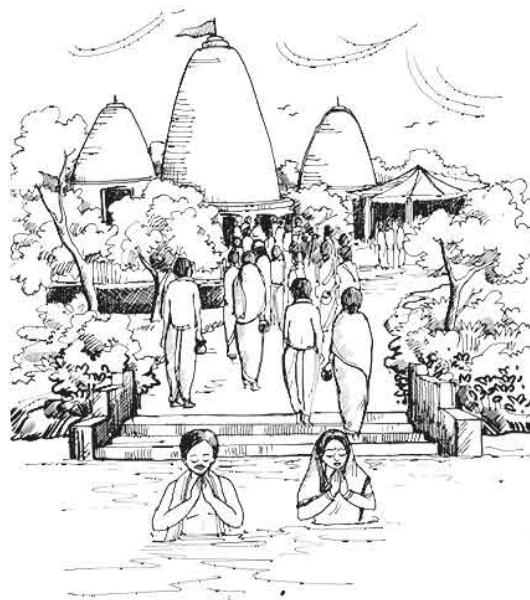
ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଧର୍ମଚରଣେର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଚ୍ଛେ : ‘ଆତ୍ମମୋକ୍ଷାଯ ଜଗନ୍ନିତାଯ ଚ ।’ ଅର୍ଥାଏ ଧର୍ମଚରଣେର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଚ୍ଛେ ନିଜେର ମୋକ୍ଷଲାଭ ଓ ଜୀବତେର କଳ୍ୟାଣ । କେବଳ ନିଜେର ମୋକ୍ଷଲାଭେର ବିଷୟେ ଚିନ୍ତା କରଲେଇ ହବେ ନା । ତାହଲେ ତା ହବେ ଏକାନ୍ତେ ଆତ୍ମସୁଖେର ଚିନ୍ତା । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ କେବଳ ନିଜେର ସୁଖେର ଚିନ୍ତା କରାର ବିଷୟଟି ମୋଟେଇ ଅନୁମୋଦନ କରେ ନା । ଆତ୍ମମୋକ୍ଷ ଚିନ୍ତାର ପାଶାପାଶ ଜୀବତେର କଳ୍ୟାଣ କରାତେ ହବେ । ନଇଲେ ଧର୍ମଚରଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥେକେ ଯାବେ । ଆର ମୋକ୍ଷଓ ଲାଭ ହବେ ନା । ସୁତରାଂ ଜୀବ ଓ ଜୀବତେର କଳ୍ୟାଣ କରା ମୋକ୍ଷଲାଭେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟ ।

ଧର୍ମକୃତ୍ୟ

ଧର୍ମର ପ୍ରୟୋଗ ତାର କୃତ୍ୟ ବା ଉପାସନାୟ, ଧର୍ମଚାରେ ଓ ଆଚରଣୀୟ ସଂକାରେ । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରେର ନିରାକାର ରୂପକେ ଉପାସନା କରା ହୟ ମତ୍ର ଜପେ ଓ ଗାନେ-କୀର୍ତ୍ତନେ । ଆବାର ସାକାର ଉପାସନା କରା ହୟ ଦେବ-ଦେଵୀର ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରେ ତୀର୍ତ୍ତରେ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୂଜାବିଧି ଅନୁସରଣ କରେ ପୂଜା କରାର ମାଧ୍ୟମେ ।

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଚର୍ଚାର କ୍ଷେତ୍ରେ କିଛୁ ଧର୍ମଚାର ଓ ସଂକାର ପାଇନ କରାତେ ହୟ । ଧର୍ମଚାରେର ମଧ୍ୟେ ରାଯେହେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଓ ଯୋଗାସନ, ରାଯେହେ ତୀର୍ଥଭ୍ରମଣ, ଗଜା ନଦୀରେ ପବିତ୍ର ଜ୍ଵଳାଶୟେ ମୂଳ, ଅଭିଧି ସେବା, ଭୂଲ୍ଲୀ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି । ସଂକାର ହଚ୍ଛେ ପ୍ରଜନ୍ମ ପରମପାରାୟ ଚଲେ ଆସା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନେର କ୍ଷେତ୍ରେ କରନ୍ତୀୟ କିଛୁ କାଜ । ସେମନ- ଜନ୍ୟକୃତ୍ୟ, ବିବାହ, ଅନ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ।

ସୁତରାଂ ଈଶ୍ୱରଭ୍ରମ, ଈଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି, କତିପର ମୌଳିକ ଧାରଣା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଧର୍ମକୃତ୍ୟେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର ସ୍ଵରୂପ ଥ୍ରକାଶ ପାଇ ।



ଏକକ କାଜ : ମୋକ୍ଷଲାଭେର କରେକଟି ଉପାୟେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଉତ୍ସେଧ କର

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হিন্দুধর্মের বিশ্বাস

পাঠ ১, ২ ও ৩ : কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ

আমরা জানি যেকোনো ধর্ম কতগুলো ধর্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভীয়ে থাকে। এই ধর্মবিশ্বাসগুলো তার ভিত্তি। কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্মের দুটি প্রধান ভিত্তি। প্রত্যেক কর্মেরই শুভ-অশুভ যে ফল উৎপন্ন হয় সেটি কর্মকর্তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হয়। চলতি জন্মে কর্মফলের ভোগ যদি শেষ না হয় তাহলে কৃতকর্মের ফল ভোগের জন্মই মানুষের পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়। একেই বলে কর্মবাদ।

আর জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম—একেই জন্মান্তরের বলে। জন্মান্তরের পেছনে রয়েছে কর্মবাদ। জন্মান্তরে কর্মফল ভোগের একটি ধর্মীয় উপাধ্যান এখন বর্ণনা করা হলো।

অনেক অনেক কাল আগে বিষ্ণুভক্ত এক রাজা ছিলেন। তার নাম ছিল ভরত। বিশ্বরূপের কন্যা পঞ্জজনাকে তিনি বিয়ে করেন। তাদের সৎসারে পৌঁচ পুত্রের জন্ম হয়। রাজা ভরত পুত্রদের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দেন। এরপর তিনি তপস্যার জন্য বনে গমন করেন। সাধনার দ্বারা রাজা ভরত হলেন সাধকভরত—মুনিভরত।

একদিন তিনি নদীতে স্নান করতে গেলেন। সেখানে দেখতে পেলেন এক হরিণী জল পান করতে এসেছে। হরিণীটির বাচা প্রসবের সময় হয়ে এসেছে। এমন সময় বনের ভেতর থেকে সিংহের গর্জন শোনা গেল। তায়ে হরিণী নদীর তীরে পড়ে যায় এবং তার গর্ভ থেকে এক বাচা হরিণের জন্ম হয়। হরিণী মৃত্যুবরণ করে। এই দৃশ্য দেখে ভরতমুনি দয়াযুক্ত চিন্তে হরিণশিশুটিকে রক্ষার জন্য নিয়ে আসেন তার আশ্রমে। মাতৃহীন হরিণশিশুর ঘরে, আদরে তার সময় কাটে। এর

ফলে মুনির তপস্যা আর রাইল না। এই হরিণশিশুর চিন্তা করতে করতে তিনি দেহত্যাগ করেন। শাস্ত্রে বলে মানুষ যেরূপ চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করেন তিনি সেই রকম জন্মান্ত করেন। তাই ভরতমুনিকেও হরিণরূপে জন্মান্ত করতে হলো। তবে হরিণ হয়ে জন্মালেও তাঁর পূর্বজন্মের কাহিনী স্মরণে ছিল। তাই হরিণজীবনেও তপস্যীদের আশ্রম প্রাণে থেকে ধর্মকথা, তপস্যার কথা শুনতে শুনতে দেহত্যাগ করে পুনরায় মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হন এবং দ্বিতীয় আরাধনা করে তার অনুগ্রহ লাভ করেন।

কর্মফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়। এই ধর্মীয় বিধান বিজ্ঞানসম্মত। প্রত্যেক কাজেরই একটা কারণ বা হেতু থাকে। আর যখনই একটা কারণ এসে পড়ে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আসে কাজের ফল। এক বালক বৃষ্টিতে ভিজে ঠাড়া জলে স্নান করে আনন্দ পায়। কিন্তু সে জানে না যে বৃষ্টিতে ভিজলে এবং ঠাড়া জলে দীর্ঘ সময় থাকলে তার অসুখ হতে পারে। সে না জানলেও কাজের ফল হিসেবে তাকে অসুখ হতে হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে কর্মের সঙ্গে কর্মের ফল সম্বন্ধযুক্ত। কর্ম করলেই কর্মফল আসে। আর সে কর্মফল অবশ্যই কর্মকর্তাকে ভোগও করতে হয়। এই পরিবর্তনহীন ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা সবাই সচেতন হব এবং শুভ-অশুভ কর্ম বিবেচনা করে



ଜୀବନେର ପଥେ ଶୁଭ କର୍ମେର ଅନୁଶୀଳନ କରବ ।

ଏକକ କାଜ : ଜନାନ୍ତରେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗେର ଧର୍ମୀୟ ଉଗାଧ୍ୟାନେର ଶିକ୍ଷା ତୋମାର ଜୀବନେ କୀତାବେ ପ୍ରତିଫଳନ କରବେ ।

ପାଠ ୪ ଓ ୫ : ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା

ଜୀବନେ ନାରୀ-ପୁରୁଷେର ନିଜମ୍ବ ଅବହାନ ରହେଛେ । ପୁରୁଷେର କର୍ମହୁଲ ପ୍ରାୟଇ ଥାକେ ଗୃହେର ବାହିରେ । ଅପରଦିକେ ଅଧିକାଂଶ ନାରୀର କର୍ମହୁଲ ତୌର ସଂସାରକେ ନିଯେ ଗଡ଼େ ଉଠେ । ଜନୋର ପରେ କନ୍ୟା ମା-ବାବାର ସ୍ନେହ-ସ୍ନେହ ବେଢ଼େ ଉଠେ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ । ବିବାହିତ ଜୀବନେ ସେ ସ୍ଵାମୀର ସରେ ଯାଇ, ସ୍ଵାମୀର ସଂସାର ତାକେ ଦେଖିତେ ହୁଏ । ବୃଦ୍ଧ ବୟସେ ଏହି ମହିଳାକେଇ ପୁତ୍ରକଳ୍ୟାଦେର ଓପର ନିର୍ଭର କରିବାତେ ହୁଏ । ଏହିଭାବେ ସମାଜେର ଏକଙ୍କନ ନାରୀର ତିନଟି ଅବହା ଦେଖା ଯାଇବା, ବଧୁ ଓ ମାତା । ବଧୁ ହିସେବେ ସ୍ଵାମୀର ସଂସାର ଦେଖା-ଶୋନା, ଛେଳେ-ମେଯେଦେର ଆଳନ-ପାଳନ, ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଵରସ୍ଥା କରା ତାର କାଜ ହୁଏ ପଡ଼େ । ଏ କାଜେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ନାରୀ ତାର ସଂସାରଧର୍ମ ପାଳନ କରେନ । ଏକଙ୍କନ ଆଦର୍ଶ ମାଯେର ହାତେ ଆଦର୍ଶ ସନ୍ତାନ ଗଡ଼େ ଉଠିବାରେ ପାରେ । ସନ୍ତାନେର କାହେ ମାଯେର ମତୋ ଆର ବନ୍ଧୁ ମେଇ । ରୋଗେ, ଶୋକେ, ଆନନ୍ଦେ, ଉତ୍ସବେ ମା-ଇ ହଞ୍ଚେନ ସନ୍ତାନେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରୟ, ଉତ୍ସାହଦାତା ଓ ଆନନ୍ଦେର ଉତ୍ସବ । ଏମନ ମାତୃରୂପୀ ନାରୀର ପ୍ରତି ସନ୍ତାନେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଞ୍ଚେ ମାକେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରା, ତୌର ଦେବୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ କରା । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହଞ୍ଚେ ମନୁସରୁହିତା । ଦେଖାନେ ସଂସାରଜୀବନେ କେମନ କରେ ଶାନ୍ତି ଏସେ ଥାକେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଉଯା ଆହେ । ଦେଖାନେ ବଳା ହୁଏଛେ, ଯେ ସଂସାରେ ନାରୀରା ଆନନ୍ଦେ-ଉତ୍ସବେ ସୁଖେ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ ସେ ସଂସାର ଈଶ୍ୱରେର କୃପାଯ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିତେ ଭରେ ଉଠେ । ତାହି ନାରୀଦେର ପ୍ରତି ସନ୍ଦର୍ଭ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଧର୍ମେର ଅଞ୍ଜା ହିସେବେ ଗ୍ରହଣ କରା ।

ଅନ୍ୟଦିକେ ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେ ଈଶ୍ୱରେର ପ୍ରକୃତି ବା ଶକ୍ତି ହଞ୍ଚେ ନାରୀ । ଏହି ଶକ୍ତିକେ ବଳା ହୁଏ ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି ମହାମାୟା । ଶକ୍ତି ଛାଡ଼ା କୋନୋ କାଜ ହୁଏ ନା । ଆର ସେଇ ଶକ୍ତିର ଦେବୀ ହଞ୍ଚେନ ନାରୀ । ଏତାବେ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତି ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରକାଶ କରେଛେ ।

ଧର୍ମାଞ୍ଜ୍ଲେ ଆରା ବଳା ହୁଏଛେ, ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିର ଜନ୍ୟ ନିଜେକେ ଦୂତାଗ କରଲେନ । ଏକ ଭାଗ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଏକ ଭାଗ ନାରୀ । ଏ ଭାଗ କିନ୍ତୁ ସମାନ ସମାନ, ବେଣି ବା କମ ନୟ ।

‘ଅର୍ଧନାରୀଶ୍ୱର’ ନାମକ ଏକଟି ପ୍ରତିମାୟ ଦେଖା ଯାଇ, ଅର୍ଦେକ ଶିବ ଓ ଅର୍ଦେକ ପାର୍ବତୀ (ଦୁର୍ଗା) । ଏର ତାଙ୍ଗର୍ଭରେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀର ସମତା ଏବଂ ନାରୀର ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବୋଧେର ପ୍ରକାଶ ।

ମହାଭାରତେ ବଳା ହୁଏଛେ, ଯେ ପରିବାରେ ନାରୀର ପ୍ରତି ସଥ୍ୟାୟୋଗ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରା ହୁଏ, ଦେବତାରା ସେ ପରିବାରେ ଆନନ୍ଦେ ବାସ କରେନ । (ଅନୁଶାସନ ପର୍ବ, ୪୬/୫) । ଅନ୍ୟଦିକେ କୋନୋ ପରିବାରେ ନାରୀ ଯଦି ଅନ୍ଧା ପାନ, ତାହଲେ ସମ୍ମତ ଶୁଭକର୍ମ ନିଷ୍ଠଳ ହୁଏ । (ଅନୁଶାସନ ପର୍ବ, ୪୬/୬) ।



নারীর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের উপায় হলো, তাঁকে পরমা প্রকৃতি দেবী আদ্যাশক্তি মহামায়ার অংশ মনে করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা এবং ধর্মগ্রন্থের অনুশাসন মেনে সমতাপূর্ণ আচরণ করা। সর্বোপরি নারীর মধ্যেও আত্মারূপে ঈশ্বর অবস্থান করেন, তাই নারীর প্রতি মর্যাদা প্রকাশ তো ঈশ্বরের প্রতি মর্যাদা প্রকাশ।

হিন্দুধর্মগ্রন্থসমূহে নারীর প্রতি মর্যাদাবোধের যে সকল দ্রষ্টান্ত রয়েছে, আমরা তা অনুসরণ করব। সর্বক্ষেত্রে সম অধিকার নারীর প্রাপ্য— এ সত্য মনে রেখে আমরা নারীর প্রতি মর্যাদা প্রকাশে উদ্বৃদ্ধ হব।

কর্মবাদ ও জন্মান্তর, নারীর প্রতি মর্যাদাবোধ, ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবা, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ ও নরকের ধারণা ইত্যাদি আরও অনেক বিশ্বাসের ওপর হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠিত। আর এ ধর্মবিশ্বাসগুলোর লক্ষ্য হলো মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষরূপে গড়ে তোলা এবং পরিবার ও সমাজকে শৃঙ্খলাপূর্ণ ও শান্তিময় করে গড়ে তোলার জন্য সকলকে উদ্বৃদ্ধ করা।

দলীয় কাজ : নারীকে কীভাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় ভূষিত করা যেতে পারে তার কয়েকটি উপায় শেখ।

নতুন শব্দ : কর্মযোগ, মাহাত্ম্য, অর্ধনারীশ্বর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. ঈশ্বরের সাকার রূপে অবতরণ করাকে বলা হয়।
২. জীবসেবা করলে সেবা করা হবে।
৩. হিন্দুধর্ম মতে ঈশ্বরের প্রকৃতি বা শক্তিকে বলা হয়।
৪. কর্ম অনুসারে ভোগ করতে হয়।
৫. ঈশ্বর ভগবান তখনই যখন জীবকে করেন।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:

বাম পাশ	ডান পাশ
১. জীবের মধ্যে ঈশ্বর	বিষ্ণুভক্ত ছিলেন
২. চিরমুক্তিলাভ মানেই হচ্ছে	আমাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলেন
৩. রাজা ভরত	আত্মারূপে অবস্থান করেন
৪. মাতৃবৃন্তী ঈশ্বর	মোক্ষলাভ পরিত্রাণ লাভ

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১. তোমার প্রাত্যহিক জীবনের কয়েকটি শুভকর্মের ব্যাখ্যা দাও।
২. জন্মান্তরবাদ বলতে কী বোঝায় ?
৩. ভরত মুনিকে হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল কেন ?
৪. কীভাবে নারীর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করা যায় ?

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ‘ব্রহ্ম, অবতার, দেব-দেবী এবং জীব-সব মিলিয়ে এক ঈশ্বর’— ব্যাখ্যা কর।
২. ‘কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ পরম্পরার সম্পর্কিত’— বুঝিয়ে লেখ।
৩. ‘আত্মযোক্ষায় জগন্মিতায় চ’— সংস্কৃত বাক্যটি ব্যাখ্যা কর।
৪. ‘মাতৃবূপই একজন নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থান’— দৃষ্টান্ত সহকারে ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঈশ্বর জীবের মধ্যে কীভুগে অবস্থান করেন ?
 ক. আআ
 গ. বায়ু
 খ. প্রাণ
 ঘ. সাকার
২. মৌক্ষিকাতের অন্যতম উপায় হচ্ছে –
 i. জীবের কল্যাণ করা
 ii. নিজের মঙ্গলের জন্য কাজ করা
 iii. জগতের হিতসাধন করা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক) i | খ) ii |
| গ) i ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

৩. পারিবারিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে অবশ্য কর্তব্য কী ?
 ক. বৃক্ষবয়সে মা-বাবাকে সেবা করা
 খ. পারিবারিক স্বচ্ছতার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া
 গ. পরিবারের নারী সদস্যদের যথাযোগ্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা
 ঘ. অতিথি ও প্রতিবেশীদের শুন্দৰা করা।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সৌমিরানি একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনি সকল কাজ করার পাশাপাশি নিজের সন্তানকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে অত্যন্ত সচেতন। কারণ তিনি জানেন যে, সন্তানকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মায়ের অবদানই প্রের্ণ।

৪. সন্তানকে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সৌমিরানির করণীয় –
 i. উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান
 ii. নৈতিক চরিত্র গঠনকে গুরুত্ব দেওয়া
 iii. স্বাবলম্বী করে তোলা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-----------|----------------|
| ক) i | খ) ii |
| গ) i ও ii | ঘ) i, ii ও iii |

৫. সৌমিরানির পারিবারিক জীবনে আচরণিক যে অবস্থানটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে তা হলো –

- i. কন্যারূপে
- ii. বধূরূপে
- iii. মাতৃরূপে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|--------|-----------|
| ক) i | খ) ii |
| গ) iii | ঘ) i ও ii |

১. সূজনশীল প্রশ্ন

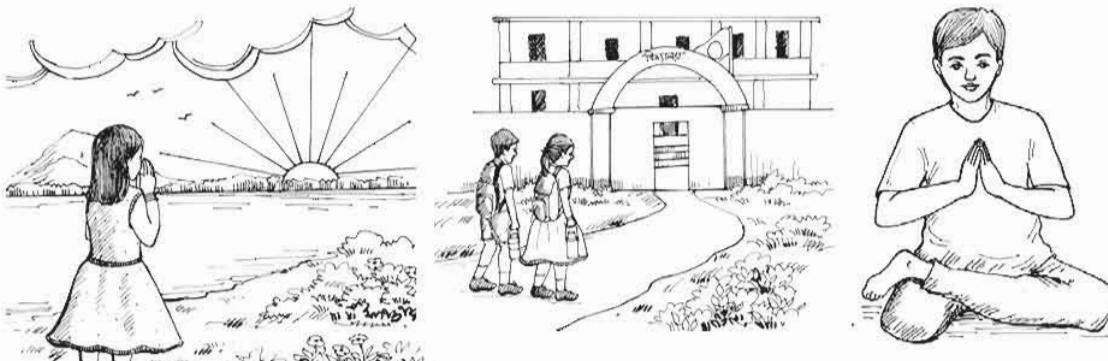
অধীরবাবু কর্মকে ধর্ম জ্ঞান করেন। মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সকলের জন্য তিনি আর্থিক, পারিবারিক বিভিন্ন কাজে সহায়তা করেন। তবে তিনি মা, বোন এবং স্ত্রীর মর্যাদা ও অধিকারের প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধাশীল। এ কাজের জন্য তিনি তাদের কাছে কিংবা সৃষ্টিকর্তার নিকট কোনো কিছু প্রত্যাশা করেন না। তার ধারণা মানুষের জন্ম একবারই হয়। পাপ-পুণ্য সবই এ পৃথিবীতে ঘটে।

- ক. ‘মোক্ষ’ কথাটির মানে কী ?
- খ. ‘জন্মান্তরের পেছনে রয়েছে কর্মবাদ’ – কথাটি ব্যাখ্যা কর।
- গ. অধীরবাবুর আচরণে হিন্দুধর্মের যে বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে, তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. মা, বোন ও স্ত্রীর প্রতি অধীরবাবুর আচরণ যথার্থ: কথাটি তোমার পঠিত ‘নারীর মর্যাদা’ বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

চতুর্থ অধ্যায়

নিত্যকর্ম ও যোগাসন

প্রাতঃকাল থেকে রাত্রিকাল পর্যন্ত প্রতিদিনের অবশ্য করণীয় কাজকে নিত্যকর্ম বলে। নিত্যকর্ম হয় প্রকার-প্রাতঃকৃত্য, পূর্বাহ্নকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য, অপরাহ্নকৃত্য, সায়াহ্নকৃত্য ও নৈশকৃত্য। এ সমস্ত কর্মের মাধ্যমে আমাদের শরীর ও মন শান্ত, পবিত্র, নির্মল, কর্মসূচি ও উত্তম ভাবনায় পরিপূর্ণ থাকে। আমাদের এই দেহ-মনকে সুস্থ রাখতে সাধনার প্রয়োজন। তাই প্রতিদিন নিয়মিত যোগাসন অনুশীলন গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং দেহকে বলশালী ও রোগমুক্ত রাখতে এবং চিকিৎসাধৰ্ম দূর করতে সুখাসন, শলভাসন, পশ্চিমোন্তানাসন অনুশীলনের উপকারিতা অনবশীকার্য। এই অধ্যায়ে নিত্যকর্মসমূহ ও যোগাসন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।



এই অধ্যায় শেষে আমরা—

- নিত্যকর্মগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব
- শলভাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব এবং অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- শলভাসনের প্রতাব বর্ণনা করতে পারব
- পশ্চিমোন্তানাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব এবং অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- পশ্চিমোন্তানাসনের প্রতাব বর্ণনা করতে পারব
- শলভাসন ও পশ্চিমোন্তানাসনের গুরুত্ব উপরিক করে এটি নিয়মিত অনুশীলনে উত্তুক হব
- শলভাসন ও পশ্চিমোন্তানাসন অনুশীলন করতে পারব।

পাঠ ১, ২, ৩ ও ৪ : নিত্যকর্মসমূহ

প্রাতঃকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সময়কালকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- (১) প্রাতঃ (২) পূর্বাহ্ন (৩) মধ্যাহ্ন (৪) অপরাহ্ন (৫) সায়াহ্ন ও (৬) নৈশ।

সময়কালের এই ছয়টি বিভাগের দিকে লক্ষ রেখে নিত্যকর্মকেও ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- (১) প্রাতঃকৃত্য (২) পূর্বাহ্নকৃত্য, (৩) মধ্যাহ্নকৃত্য (৪) অপরাহ্নকৃত্য (৫) সায়াহ্নকৃত্য ও (৬) নৈশকৃত্য।

১। প্রাতঃকৃত্য : সূর্যোদয়ের কিছু আগে ঘূম থেকে উঠে বিছানার উপরে পূর্ব বা উত্তরমুখ হয়ে বসে ইশ্বর বা দেব- দেবীদের স্মরণ করে মন্ত্র পাঠ করতে হয়। এ জন্য ধর্মগ্রন্থে মন্ত্র বা প্রোক রয়েছে। নিচে একটি মন্ত্র সরলার্থসহ দেয়া হলো :

ত্রিশা মুরারিত্রিপুরান্তকারী
ভানুঃ শঙ্গী ভূমিসুতো বৃথচ ।
গুরুচ শুক্রঃ শনিরাহুকেতুঃ
কুর্বেন্তু সর্বে মম সুপ্রভাতম্ ॥

সরলার্থ : ত্রিশা, মুরারি (কৃষ্ণ), ত্রিপুরাসুরের বিনাশকারী শিব, সূর্য, চন্দ্র, ভূমিপুত্র বৃথ, গুরু বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু সকলে আমার প্রভাতটিকে যেন সুন্দর করেন।

একক কাজ : প্রাতঃকালের মন্ত্রটি আবৃষ্টি কর।

এরপর গুরুকে শ্রান্ত করে ঘর থেকে বাইরে এসে পৃথিবীকে ও সূর্যকে প্রণাম করতে হয়। প্রতিদিন সকাল এবং সম্ম্যায় পিতামাতাকে প্রণাম করতে হয়। তারপর হাত-মুখ ধূয়ে, স্নান করে পরিষ্কার জামাকাপড় পরতে হয়।

২। পূর্বাহ্নকৃত্য : প্রাতঃকৃত্যের পরে এবং মধ্যাহ্ন বা দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে যে সকল কাজ করা হয়, তাই পূর্বাহ্নকৃত্য। এই সময়ে প্রার্থনা, উপাসনা ও পূজা করতে হয়। এই কৃত্য প্রতিদিন পরিবারের সকলেরই পালন করা উচিত। তারপর দিনের অন্যান্য কাজকর্ম করতে হয়। যেমন-আহার করা, কর্মসূলে যাওয়া, গৃহস্থালির কাজকর্ম করা, অধ্যয়ন বা বিদ্যালয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

একক কাজ : তোমার পূর্বাহ্নকৃত্যের একটি তালিকা তৈরি কর।

৩। মধ্যাহ্নকৃত্য : পূর্বাহ্নের পর এবং অপরাহ্নের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে যে কাজ করা হয়, তা-ই মধ্যাহ্নকৃত্য। এই সময়টাকে বলে দুপুর। দুপুরের কাজ খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রাম করা। যদি দুপুরে কোনো অতিথি আসে তাকে শুন্ধার সঙ্গে খাওয়াতে হয়। কারণ শাস্ত্রে বলে, অতিথি নারায়ণ, অতিথির সেবা করলে ইশ্বরের সেবা করা হয়।

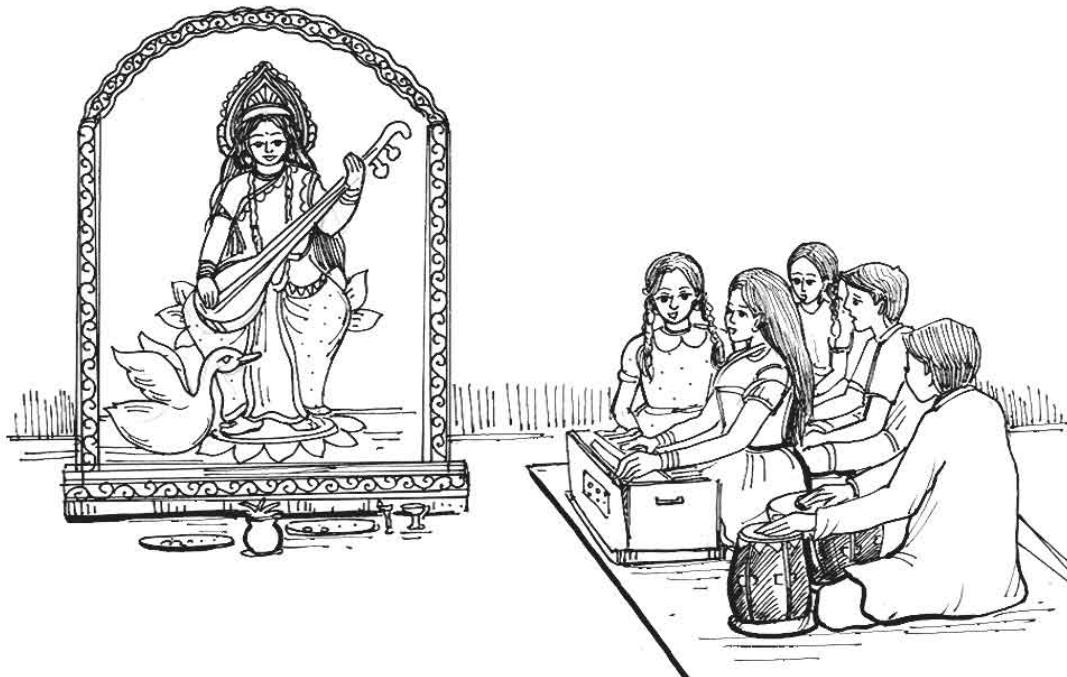
৪। অপরাহ্নকৃত্য : দুপুরের পর এবং সায়াহ্নের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে যে কাজ করা হয় তাকেই বলে অপরাহ্নকৃত্য। এই সময়টাকে বলে বিকাল, এই সময়ে নিজের এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় কাজ করতে হয়। এছাড়া প্রতিদিন বিকেলে খেলাখুলা, ব্যায়াম বা অম্বণ করলে শরীর ভালো থাকে।

৫। সায়াহ্নকৃত্য : সায়াহ্ন মানে সম্ম্যায়। সম্ম্যাকালে আবার হাত-মুখ ধূয়ে পরিচ্ছন্ন হতে হবে। তারপর ইশ্বরের উপাসনা করতে হবে। সাধারণ কথা, স্তব বা গানে শুন্ধা-ভক্তিতে ইশ্বরের গুণগান করতে হবে। নিচে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গান তুলে ধরা হলো :

ଧୀର ସେନ ମୋର ସକଳ ଭାଲୋବାସା

- ପ୍ରଭୁ, ତୋମାର ପାନେ, ତୋମାର ପାନେ, ତୋମାର ପାନେ ।
 ସାଯା ସେନ ମୋର ସକଳ ଗଭୀର ଆଶା
- ପ୍ରଭୁ, ତୋମାର କାନେ, ତୋମାର କାନେ, ତୋମାର କାନେ ।
 ଚିତ୍ତ ମମ ସଖନ ସେଥା ଥାକେ ସାଡ଼ା ସେନ ଦେଇ ଦେଇ ତବ ଡାକେ,
 ସତ ସୀଧନ ସବ ଟୁଟେ ଗୋ ଯେନ
- ପ୍ରଭୁ, ତୋମାର ଟାନେ, ତୋମାର ଟାନେ, ତୋମାର ଟାନେ ।
 ବାହିରେର ଏଇ ଭିକ୍ଷା-ଭରା ଥାଲି ଏବାର ସେନ ନିଃଶେଷେ ହୁଯ ଥାଲି,
 ଅନ୍ତର ମୋର ଗୋପନେ ଯାଇ ଭରେ ।
- ପ୍ରଭୁ, ତୋମାର ଦାନେ, ତୋମାର ଦାନେ, ତୋମାର ଦାନେ ।
 ହେ କମ୍ପୁ ମୋର, ହେ ଅନ୍ତରଭର, ଏ ଜୀବନେ ଯା କିଛି ସୁନ୍ଦର
 ସକଳଇ ଆଜ ବେଜେ ଉଠୁକ ସୁରେ
- ପ୍ରଭୁ, ତୋମାର ଗାନେ, ତୋମାର ଗାନେ, ତୋମାର ଗାନେ ॥

ଦୀର୍ଘ କାଜ : ରାଧାକୃତୀର ଗାନେର ଶିକ୍ଷାସମୂହ ଟିକିତ କର ।



୬ । **ନୈଶକୃତ୍ୟ :** ସମ୍ବନ୍ଧୀୟର ପର ଥେବେ ସୁମାତ୍ରେ ଯାଓଯା ପରିଷତ୍ ସମସ୍ୟକାଣ୍ଡେର କାଜକେ ନୈଶକୃତ୍ୟ ବଳା ହୁଯ । ଏ ସମୟେ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଥ୍ୟୋଜନୀୟ କାଜ କରା ହୁଯ । ରାତ୍ରେର ଆହାର ପ୍ରାହଣ କରାତେ ହୁଯ । ତାରପର ଶୟନ କରେ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଵର
 ‘ପଦ୍ମନାଭ’ ନାମଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାତେ ହୁଯ । କାରଣ ଶାନ୍ତି ବଳା ହେଯେହେ—‘ଶୟନେ ପଦ୍ମନାଭଃ’ ।

୭ । ନତ୍ତନ ଶବ୍ଦ : ପ୍ରାତଃକୃତ୍ୟ, ମୁରାରି, ରାହୁ, କେତୁ, ପୂର୍ବାହୁକୃତ୍ୟ, ମଧ୍ୟାହୁକୃତ୍ୟ, ଅପରାହୁକୃତ୍ୟ, ସାଯାହୁ ।

পাঠ ৫ ও ৬ : শলভাসন

শলভাসনের ধারণা : ‘শলভ’ শব্দের অর্থ পতঙ্গ। আসন অবস্থায় দেহটি অনেকটা পতঙ্গের মতো দেখায়, তাই আসনটির নাম শলভাসন।

অনুশীলন গুরুত্ব : মাটির উপর বা শক্ত জায়গায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। চিবুক মাটির উপর থাকবে। দুহাত সোজা করে দেহের দুপাশে উরুর নিচে এবং হাতের তালু দুটো মাটিতে সমান করে পাতা থাকবে, আঙুলগুলো গায়ে গায়ে লেগে থাকবে। ইটু, উরু ও পায়ের গোড়ালি জোড়া রাখতে হবে।



এরপর শ্বাস ধীরে ধীরে গ্রহণের সাথে ইটু তাঁজ না করে উরু ও পা দুটি সোজা রেখে মেঝে থেকে দেড় থেকে দুহাত উপরে ভুলতে হবে। এই অবস্থায় ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। আসনটি ৪/৫ বার অনুশীলন করতে হবে এবং প্রতিবার শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

একক কাজ : শলভাসনটি অনুশীলন করে দেখাও।

প্রভাব : কোমর ও মেরুদণ্ডের যে কোনো ব্যথায় এই আসন উপকারী। আসনটি মেরুদণ্ডকে নমনীয় ও সবল করে, তলপেট ও পিঠের নিচের অংশের মেদ কমায়। এতে উরু ও কোমরের পেশির গঠন সুস্পর হয়, হৃৎপিণ্ড সবল হয়। আসনটি বাত বা সায়টিকার এক আচর্য প্রতিষেধক। ক্ষুধামল্লা অস্ত্র, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি রোগ নিরাময়ে এই আসন ফলপ্রদ। এই আসনে গ্যাস্ট্রিক সমস্যা দূর হয়, পেটে বায়ুর প্রকোপ কমে, পেটকাঁপা সারে, হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়। যারা কোলকুঁজো, এই আসন তাদের জন্য বিশেষ উপকারী।

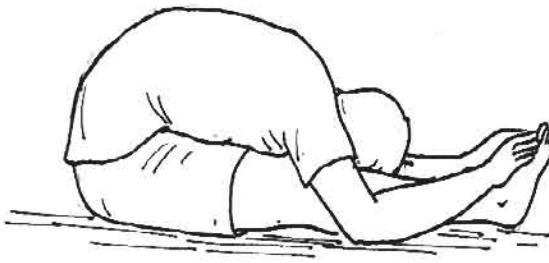
দ্বিতীয় কাজ : শলভাসনের উপকারিতা শিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : শলভাসন, পতঙ্গ, চিবুক, আচর্য, প্রতিষেধক, নমনীয়, অস্ত্র, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রকোপ, ফলপ্রদ, কোলকুঁজো।

ପାଠ ୭ ଓ ୮ : ପଚିମୋହାନାସନ

ପଚିମୋହାନାସନର ଧାରণା : ସେ ଆସନଟିତେ ପଚିମ ଅର୍ଥାଏ ଶରୀରର ପିଛନ ଦିକେ ବେଶ ବ୍ୟାୟାମ ହୁଏ, ତାର ନାମ ପଚିମୋହାନାସନ ।

ଅନୁଶୀଳନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ : ଦୁ ପା ସୋଜା କରେ ସାମନେର ଦିକେ ଛଡ଼ିଯେ ବସନ୍ତେ ହୁବେ । ଏରପର ଦୁହାତ ସୋଜା କରେ ଡାନ ହାତେର ବୁଡ୍ଢୋ ଆଙ୍ଗୁଳ, ତର୍ଜନୀ ଆର ମଧ୍ୟମା ଦିଯେ ଡାନ ପାଯେର ବୁଡ୍ଢୋ ଆଙ୍ଗୁଳ ଏବଂ ବୀ ହାତେର ବୁଡ୍ଢୋ ଆଙ୍ଗୁଳ, ତର୍ଜନୀ ଆର ମଧ୍ୟମା ଦିଯେ ବୀ ପାଯେର ବୁଡ୍ଢୋ ଆଙ୍ଗୁଳ ଶକ୍ତ କରେ ଚେପେ ଧରନ୍ତେ ହୁବେ । ମେରୁଦଣ୍ଡ ଟାନଟାନ ଓ ପିଠ ସମାନ ରାଖନ୍ତେ ହୁବେ । ଏରପର ଚୋଖ ବଜ୍ଜ ଲେଖେ ହାତୁଟି କପାଳ ଠେକାତେ ହୁବେ । ସେଇ ସଜ୍ଜେ ହାତେର କନୁଇ ଭାଙ୍ଗ କରେ ହାତୁଟିର ପାଶେ ରାଖନ୍ତେ ହୁବେ । ପେଟ ଓ ବୁକ ଯଥାସମ୍ବୂଦ୍ଧ ଉତ୍ତର ସଜ୍ଜେ ମିଶେ ଥାକିବେ । ଶ୍ୟାମ-ପ୍ରଶ୍ନାସ ଶାତ୍ରାବିକ ରେଖେ ଏ ଅବସ୍ଥାଯ ୩୦ ମେନ୍ଦରେ ଥାକନ୍ତେ ହୁବେ । ଏରପର ନିଃଶ୍ଵାସ ନିଯୋଗ ହାତୁଟି ଥିବାକୁ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁଳେ, ଦୁ ପାଯେର ବୁଡ୍ଢୋ ଆଙ୍ଗୁଳ ଛେଡ଼େ ଦିଯେ ୩୦ ମେନ୍ଦରେ ଶବ୍ଦାବ୍ୟାୟ ନିତେ ହୁବେ । ଏତାବେ ୩/୪ ବାର ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତେ ହୁବେ ।



ଏକକ କାଜ : ପଚିମୋହାନାସନଟି ଅନୁଶୀଳନ କରେ ଦେଖାଉ ।

ପ୍ରତିବାଦ : ଆସନଟି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଓ ପେଟେର ପକ୍ଷେ ବିଶେଷ ଉପକାରୀ । ଏହି ଆସନେ ଗୋଟା ମେରୁଦଣ୍ଡ ସତେଜ ହୁବେ । ହାତୁଟି ପିଛନ ଦିକେର ପେଶି ଏବଂ ପେଟେର ସମନ୍ତ ସମ୍ବୂଦ୍ଧ ହୁବେ, ତାଦେର କର୍ମଦକ୍ଷତା ବାଢ଼େ । ଏହି ଆସନେ ଅର୍ପଳ, କୁଞ୍ଚାମଳ୍ପା, ଆମାଶୟ, ପେଟେ ବାଯୁ ପ୍ରଭୃତି ଝାଗେର ଉପଶମ ହୁବେ, ହଜମଶଙ୍କି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ । ମ୍ଲାୟଦୌର୍ବଲ୍ୟ, ସାଯାଟିକା, ବାତ ଓ ଡାଯାବେଟିସ ରୋଗେ ଏହି ଆସନେ ଉପକାର ପାଇଯା ଯାଇ । ଏତେ କିନ୍ତୁ ନିଃଶ୍ଵାସ ଭାଲୋ ଥାକେ । ପେଟ ଓ କୋମରେର ମେଦ କମିଯେ ଦେହର ଗଡ଼ନ ସୁନ୍ଦର କରେ । କିଶୋର-କିଶୋରୀଦେର ଲଧା ହତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ମନେର ଅସ୍ଥିରତା, ଚକ୍ଷୁରତା ଓ ଉଦୟମହୀନତା ନିବାରଣେ ଏହି ଆସନ ଖୁବଇ ଉପକାରୀ ।

ଯାଦେର ସ୍ଵର୍ଗତ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଯେହେ ବା ଯାଇବା ଏପେଡିସାଇଟିସ ବା ହରିନ୍ଦ୍ରାୟ ଭୁଗ୍ରହଣ, ତାଦେର ଏହି ଆସନଟି ଅନୁଶୀଳନ କରା ନିବେଦି ।

ଦ୍ୱାରା କାଜ : ପଚିମୋହାନାସନ ଅନୁଶୀଳନେ ସେ ସମସ୍ତ ଉପକାର ପାଇଯା ଯାଇ ତାର ଏକଟି ତାଲିକା ତୈରି କର ।

ନୃତ୍ୟ ଶବ୍ଦ : ପଚିମୋହାନାସନ, ତର୍ଜନୀ, ମଧ୍ୟମା, ଟାନଟାନ, ସତେଜ, ଅର୍ପଳ, ଉଦୟମହୀନତା, ଉପଶମ, ମ୍ଲାୟଦୌର୍ବଲ୍ୟ, ସାଯାଟିକା, ସ୍ଵର୍ଗତ, ଏପେଡିସାଇଟିସ, ହରିନ୍ଦ୍ରାୟ ।

ଅନୁଶୀଳନି

ଶୁନ୍ୟକ୍ଷାଳ ପୂରଣ କର :

୧. ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧାୟ ପ୍ରଶାମ କରନ୍ତେ ହୁବେ ।
୨. ଅଭିଧିର ସେବା କରଲେ ସେବା କରା ହୁବେ ।
୩. ସାଯାହନ ମାନେ ।
୪. ଧ୍ୟାନେର ପକ୍ଷେ ଉତ୍ସମ ।
୫. ଶଳକ ଶଦେର ଅର୍ଥ ।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:

ବାମ ପାଶ	ଡାନ ପାଶ
୧. ସାଧାରଣ କଥା, ସ୍ତବ ବା ଗାନେ	ବେଶି ବ୍ୟାୟାମ ହୁଏ ଟେଶ୍‌ରେର ଗୁଣଗାନ କରାତେ ହୁଏ
୨. ଦୁଃଖରେର ଆହାର ଗ୍ରହଣ ଓ ବିଶ୍ଵାମ ନେଓଯା	ମଧ୍ୟାହ୍ନକୃତ୍ୟ
୩. ପଚିମୋହନାସନେ ଶରୀରେର ପିଛନ ଦିକେ	ଉପୁଡ଼ କରେ ରାଖାତେ ହେବେ

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও :

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

- ନିତ୍ୟକର୍ମସମୂହ ଉଦାହରଣସହ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
 - କୀତାବେ ଶଲଭାସନ ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
 - ଶ୍ରୀର-ମନେର ଓ ପର ଶଲଭାସନେର ନିୟମିତ ଅନୁଶୀଳନେର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।

ବୁଦ୍ଧନିର୍ଦ୍ଧାଚନି ପ୍ରକ୍ଷେତ୍ର :

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক) i ও ii
গ) i ও iii

খ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রমা সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। সে লেখাপড়া ও আচরণে খুব ভালো। কিন্তু সে সবসময় ঝুঁজো হয়ে থাকে। একদিন শিক্ষক তাকে একটি আসন অনুশীলনের পরামর্শ দেন। রমা শিক্ষকের পরামর্শ মেনে চলে অনেক উপকার পেয়েছে।

୪. ଶିକ୍ଷକ ରମାକେ କୋଣ ଆସନ ଅନୁଶୀଳନେର ପରାମର୍ଶ ଦେଲ ?

- | | | | |
|----|---------|----|-------------|
| କ. | ପଦ୍ମାସନ | ଖ. | ସୁଖାସନ |
| ଗ. | ଶଲଭାସନ | ଘ. | ପଚିମୋହାନାସନ |

୫. ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତ ଆସନଟି ଅନୁଶୀଳନେର ଫଳେ ରମା ଯେ ଉପକାର ପେଯେଛେ ତା ହଲୋ –

- ମେରଦେଉ ସୋଜା ହେଉଥାଏ
- ହୃଦୟପିଣ୍ଡ ଧଢ଼ଫଢ଼ କରା
- କୋମରେର ପେଶିର ଗଠନ ସୁନ୍ଦର ହେଉଥାଏ

ନିଚେର କୋଣଟି ସଠିକ ?

- | | | | |
|----|---------|----|-------------|
| କ) | i ଓ ii | ଖ) | ii ଓ iii |
| ଗ) | i ଓ iii | ଘ) | i, ii ଓ iii |

ସୂଜନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ :

୧. ସଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣିର ଛାତ୍ର ସୂଜନେର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଖର୍ବାକୃତି । କିନ୍ତୁ ଏ ବସେ ମୋଟା ହେଉଥାଏ ସୂଜନେର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମେ ଅସଜାତି ଦେଖା ଦେଯ । ସୂଜନେର ମା-ବାବା ଚିନ୍ତିତ ହେଁ ପଡ଼େନ । ତାକେ ଡାକ୍ତାରେର କାହେ ନିଯେ ଗେଲେ ଡାକ୍ତାର ତାକେ ଯୋଗାସନ ଅନୁଶୀଳନର ମାଧ୍ୟମେ ଶରୀରକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାର ପରାମର୍ଶ ଦେନ । ସୂଜନ ଡାକ୍ତାରେର ପରାମର୍ଶ ମେନେ ଚଲେ ଅନେକ ଉପକାର ପେଯେଛେ ।

- କଥନ ସୂମ ଥେକେ ଉଠିତେ ହବେ ?
- ଖ. ସାଯାହକୃତ୍ୟେର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ।
- ଗ. ସୂଜନ କୋଣ ଯୋଗାସନଟି ନିୟମିତ ଅନୁଶୀଳନ କରେ ସୁଫଳ ପେଯେଛେ ? ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତ ଆସନଟିର ଅନୁଶୀଳନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
- ଘ. ‘ସୂଜନେର ଅନୁଶୀଳନକୃତ ଆସନଟିର ଉପକାରିତା ବହୁମୁଖୀ’ – ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ।

পঞ্চম অধ্যায়

দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ

ঈশ্বর নিরাকার হলেও জগতের প্রয়োজনে বিভিন্ন রূপে তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। ঈশ্বরের কোনো গুণ বা শক্তি যখন আকার পায় তখন তাকে দেবতা বা দেব-দেবী বলে। যেমন-ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, মনসা প্রভৃতি। এ সকল দেব-দেবী ঈশ্বরের বিশেষ গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। আমরা এসকল দেব-দেবীর পূজা করে থাকি।

পূজা শব্দের অর্থ প্রশংসন করা বা শুন্ধা করা। কিন্তু ইন্দুর্মৰ্মে পূজা শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পূজা কলতে বোঝায় ঈশ্বরের প্রতীক বিভিন্ন দেব-দেবীকে ফুল ও নানা উপকরণ দিয়ে শুন্ধা নিবেদন বা প্রশংসন করা। এজন্য মন্ত্র পাঠ করে পুস্পাঙ্গলি, আরতি এবং ধ্যান করাসহ বিভিন্ন মাজালিক কাজ করা হয়।



পার্বণ শব্দের অর্থ হলো পর্ব বা উৎসব। উৎসব মানে আনন্দপূর্ণ অনুষ্ঠান। পূজা-পার্বণ বলতে আমরা বুঝি, যে পর্বগুলো পূজা অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে এবং ঈশ্বর বা দেব-দেবীর প্রতি ভক্তির সূচিটি করে। পূজা-পার্বণের এসকল বিষয়ের মধ্যে রয়েছে প্রতিমা নির্মাণ, মন্দির সাজানো, বিভিন্ন ধরনের বাদের আয়োজন বিশেষ করে ঢাক, চোল, ঘষ্টা, কাঁশি, শঙ্খ এবং ভজনের সাথে ভাব বিনিময়, কিছুটা বিচ্ছিন্ন খাওয়া-দাওয়া, বিভিন্ন ধরনের আনন্দমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন, পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছন্ন পরিধান ইত্যাদি। দেবদেবীর পূজা করার জন্য বিশেষ পূজাবিধি অনুসরণ করতে হয় যা বিভিন্ন দেব ও দেবী অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এ অধ্যায়ে আমরা পূজাবিধির ধারণা, লক্ষ্মী পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা এবং এসব পূজার গুরুত্ব, পূজাতি, পুস্পাঙ্গলি ও প্রণামমন্ত্র এবং পূজার শিক্ষা ও প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- পূজাবিধির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- লক্ষ্মীদেবীর পরিচয় বর্ণনা করতে পারব
- লক্ষ্মীদেবীর পূজাপদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- লক্ষ্মীপূজার পুস্পাঙ্গলি ও প্রণামমন্ত্র সংকৃত ভাষায় বলতে পারব এবং বাংলা অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব
- জীবনচারনে লক্ষ্মীপূজার শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- বিশ্বকর্মা দেবের পরিচয় বর্ণনা করতে পারব
- বিশ্বকর্মা দেবের পূজাপদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- বিশ্বকর্মা পূজার পুস্পাঙ্গলি ও প্রণামমন্ত্র সংকৃত ভাষায় বলতে পারব এবং বাংলা অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব
- পারিবারিক ও সমাজ জীবনে বিশ্বকর্মা পূজার শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- লক্ষ্মী ও বিশ্বকর্মা পূজার্চনায় উদ্বৃদ্ধ হব।

ପାଠ ୧, ୨ ଓ ୩ : ପୂଜାବିଧି

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମେ ପୂଜା କରାର ଜନ୍ୟ କତଗୁଲୋ ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରା ହୁଏ । ଏ ସକଳ ନିୟମନୀତିଗୁଲୋକେ ପୂଜାବିଧି ବଲେ । ପ୍ରତିମା, ଘଟ, ପଟ (ଛବି), ମଞ୍ଜ, ଶାଲାମ, ପୁଷ୍ଟକ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଓ ଜଳ ଏ ଆଟଟି ବସ୍ତୁର ସେ- କୋନୋ ଏକଟି ବସ୍ତୁତେ ପୂଜା କରା ଯାଏ । ଏ ଆଟଟି ବସ୍ତୁକେ ପୂଜାର ଆଧାର ବଲେ । ଏ କାରଣେ ପୂଜାର ଆଧାର ହିସେବେ ଏଗୁଲୋର କୋନୋ-ନା-କୋନୋଟିର ସ୍ୟବହାର ଦେଖା ଯାଏ । ପୂଜା କରାର ମୌଳିକ ଦିକଗୁଲୋର ମଧ୍ୟେ ରଯେଛେ ଦେବ-ଦେଵୀର ଆବାହନ, ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାଣଥିତ୍ତା, ପୂଜାମତ୍ତ୍ଵ ପାଠ, ପୁରୁଷାଙ୍ଗଳି ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରାର୍ଥନାମତ୍ତ୍ଵ ପାଠ, ପ୍ରଗମମତ୍ତ୍ଵ ପାଠ ଓ ବିସର୍ଜନ । ଏ ଛାଡ଼ାଓ ସେ କୋନୋ ପୂଜା କରାର ପୂର୍ବେ ପଞ୍ଚଦେବତାର ପୂଜା କରା ହୁଏ । ପଞ୍ଚଦେବତା ହଜେନ : ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ତିମ ଓ କାଳୀ । ପୂଜା କରାର ଜନ୍ୟ ବେଶକିଛୁ ସାଧାରଣ ବିଧି ବା ନିୟମ-ନୀତି ରଯେଛେ । ନିଚେ କିଛୁ କିଛୁ ବିଧିର ଉତ୍ସେଖ କରାଇଲୋ—



- ଆସନଶୁଦ୍ଧି ଓ ଆଚମନ :** ଏ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାର ପୂର୍ବେ ପୂଜାର ଉପକରଣମୂହଁ ଶୁଦ୍ଧି କରେ ନିତେ ହୁଏ । ଶୁଦ୍ଧି କରା ବଲାତେ ଦୋସମୁକ୍ତ କରାକେ ବୋବାନୋ ହୁଏ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରେ ଆସନଶୁଦ୍ଧି, ଜଳଶୁଦ୍ଧି, କରଶୁଦ୍ଧି, ପୁରୁଷଶୁଦ୍ଧି କରେ ପୂଜାର ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାତେ ହୁଏ । ଅତଃପର ଆଚମନ କରାତେ ହୁଏ । ଆଚମନ ବଲାତେ ହାତ, ପା, ଚୋଖ ପରିଷକାର ଜଳ ଦିଯେ ଧୂଯେ ବିଶ୍ଵଜ ଜଳ ତିନବାର ପାନ କରାତେ ହୁଏ । ଏ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ୍ତ୍ଵ ପାଠ କରାତେ ହୁଏ । ଆଚମନେର ସାଥେ ତଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକେ ଅ଱ଣ କରାତେ ହୁଏ । ଅତଃପର ସ୍ଵିତ୍ବାଚନ । ସ୍ଵିତ୍ବାଚନ ବଲାତେ ଶୁଭକାମନା ବୋବାନୋ ହୁଏ । ସାଧାରଣତ ପୂରୋହିତ ପୂଜାର ଶୁରୁତେ ସେ ଶୁଭ ବା ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେନ ତାକେ ସ୍ଵିତ୍ବାଚନ ବଲେ ।
- ସଂକଳ ଗ୍ରହଣ :** ଏ ବିଧି ଅନୁସାରେ ସଠିକତାବେ ପୂଜାକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନେର ଜନ୍ୟ ସଂକଳ ଗ୍ରହଣ କରାତେ ହୁଏ । ସଂକଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ।
- ପୂଜାର ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବ-ଦେଵୀକେ ଆମରଣ ଜାନାନୋ, ଚକ୍ରଦାନ ଓ ପ୍ରାଣଥିତ୍ତା:** ପୂଜାର ପ୍ରଥମ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେବ-ଦେଵୀର ପ୍ରତିମା ବା ପଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ ପୂଜା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣେ ଜନ୍ୟ ହୁଦିଯ ଦିଯେ ଆମରଣ ଜାନାନୋ ହୁଏ । ବିଶ୍ୱାସ କରା ହୁଏ, ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବ-ଦେଵୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିମାର ମଧ୍ୟେ ଅବହାନ କରାହେ । ପ୍ରତିମାଯ ଚକ୍ର ଦାନ କରେ ନିତେ ହୁଏ । ଅତଃପର ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବ-ଦେଵୀର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରା ହୁଏ ।
- ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବ-ଦେଵୀର ଧ୍ୟାନ, ପୂଜାମତ୍ତ୍ଵ ପାଠ, ପୁରୁଷାଙ୍ଗଳି, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଜ୍ଞାସମର୍ଗଣ ଓ ନମ୍ବକାର ପ୍ରଦାନ :** ଏ ବିଧି ଅନୁସାରେ ମଜ୍ଜାପାଠେର ମଧ୍ୟମେ ଦେବ-ଦେଵୀର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଧ୍ୟାନ, ପୂଜା, ପୁରୁଷାଙ୍ଗଳି ଅର୍ଗପ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ପ୍ରଗମ କରା ହୁଏ । ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟମେ କୋନୋ ଭୁଲକ୍ରତି ହେଲେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଦେବ-ଦେଵୀର କାହେ ଆମାଦେର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣେର ଜନ୍ୟ ଆଜ୍ଞାସମର୍ଗଣ କରା ହୁଏ । ଦେବ-ଦେଵୀର ପୂଜା କରାର ଜନ୍ୟ ଏ ବିଧିଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

৫. আরতি প্রদান ও বিসর্জন: এ বিধি অনুসারে অভীষ্ট দেব-দেবীর উদ্দেশে আরতি প্রদান করা হয়। আরতির সময় অভীষ্ট দেব-দেবীর কাছে আমাদের তিতির ও বাইরের সকল খারাপ দিকসমূহ দূর করে দেয়ার জন্য কর্পুর প্রচ্ছলিত

করে প্রার্থনা করা হয় এবং সকল পূজারিকে আশীর্বাদ প্রদান করা হয়। এ বিধির মাধ্যমে অভীষ্ট দেব-দেবীর ওপর আমাদের গভীর শৃঙ্খা-ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশেষে অভীষ্ট দেব-দেবীর প্রতিমাকে বিসর্জন দেয়া হয়।

এ ছাড়াও পূজার সর্বক্ষণ গ্রহণ, একটু একটু করে জল পান করার জন্য জল সমর্পণ, দেব-দেবীকে অগ্নৎকরণ সমর্পণ, ছাতা সমর্পণ, পাখা (চামর) বিসর্জন প্রভৃতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

উপচারের ভিত্তিতে পূজার প্রকারভেদ : সাকারযুক্ত দেব-দেবীর পূজা বিভিন্ন উপচার অনুসারে বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে।

পঞ্চোপচার পূজা : উপচার শব্দের অর্থ উপকরণ। পঞ্চোপচার পূজা শীচটি উপকরণের মাধ্যমে করা হয়। গৰ্ব, পুক্ষ, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এ শীচটি পঞ্চোপচার পূজার উপকরণ।

দশোপচার পূজা: দশোপচার পূজা দশটি উপকরণের মাধ্যমে করা হয়। পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, গৰ্ব, পুক্ষ, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য—এ দশটি দশোপচার পূজার উপকরণ।

ষোড়শোপচার পূজা: আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বসন, আভরণ, গৰ্ব, পুক্ষ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বসনা— এ ষোড়শটি উপকরণ দিয়ে ষোড়শোপচার পূজা করা হয়।

অঞ্চলভেদে পূজাবিধির কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা যায়। তবে সাধারণ ভাবে সকল অঞ্চলের পূজাপদ্ধতি একই রকম।

একক কাজ : পূজার সাধারণবিধিসমূহ শেখ।

পাঠ ৪ ও ৫: শ্রীশ্রী লক্ষ্মীদেবীর পরিচয় ও পূজা পদ্ধতি



লক্ষ্মীদেবীর পরিচিতি

দেবী লক্ষ্মী সম্পদ, সম্মিতি ও সৌভাগ্যের দেবী। তিনি সুন্দরী ও মার্যাদামূলী দেবী। তিনি পূজারিদের ধন-সম্পদ দান করে থাকেন। তাঁর বাহন শৈঁচা।

দেবী লক্ষ্মী শ্রী হিসেবে অভিহিত। কেননা তিনি সৌন্দর্য ও মিষ্টিতার প্রতীক। তিনি তগবান বিষ্ণুর সহধর্মী।

দেবী লক্ষ্মী অত্যন্ত সুন্দর এবং দুই হাতবিশিষ্ট। তিনি পদ্মফুলের উপর উপবিষ্ট। দেবী লক্ষ্মীর গায়ের রঙ ধূসর, সাদা, উজ্জ্বল হলুদ ও নীলাভ হয়ে থাকে। শ্রীশ্রীলক্ষ্মী সৌন্দর্যের দেবী, সম্পদের দেবী। আমাদের পরিবারের উন্নতি নির্ভর করে সম্পদের ওপর। আর এই সম্পদগুলোর মধ্যে রয়েছে ভূমি, পশু, শস্য, জ্ঞান, ধৈর্য, সততা, শুদ্ধতা ইত্যাদি।

ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ପଞ୍ଚତି : ସେ କୋଣୋ ପୂଜା କରାତେ ପୂଜାବିଧି ଅନୁସରଣ କରାତେ ହୁଏ । ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାର ପଞ୍ଚତି ହିସେବେ ଶୁଦ୍ଧ ଆସନେ ବସେ ଆଚମନ ଥେକେ ଶୁରଚ କରେ ପଞ୍ଚଦେବତାର ପୂଜା କରାତେ ହୁଏ । ଅତଃପର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଧ୍ୟାନ କରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଦିଯେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପୂଜା କରା ହୁଏ । ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ପଞ୍ଚୋପଚାର, ଦଶୋପଚାର ବା ସୋଡ଼ଶୋପଚାରେ କରା ହେଁ ଥାଏ । ପୂଜାର ମୌଳିକ ନୀତି ହିସେବେ ଦେବୀ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀର ଧ୍ୟାନ, ପୂଜାମତ୍ତ୍ଵ ପାଠ, ପୁରୁଷାଙ୍ଗଳି ପ୍ରଦାନ, ଓ ପ୍ରଣାମମତ୍ତ୍ଵ ପାଠ କରାତେ ହୁଏ । ଅବଶ୍ୟେ ବିସର୍ଜନ ଦିତେ ହୁଏ ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାର ସମସ୍ତକଳ : ସାଧାରଣତ ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧତିବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା କରା ହୁଏ । ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାଯ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପୀଚାଳି ପାଠ କରା ହୁଏ । ଆଖିନ ମାସେର ଶୁକ୍ଳପଦେର ପୂର୍ଣ୍ଣମାତିଥିତେ ବିଶେଷଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା କରା ହୁଏ । ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା କୋଜାଗରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ନାମେ ପରିଚିତ ।

ଏକକ କାହିଁ : ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ-ସମ୍ପଦେର ଦେବୀ, ଏ ଦେବୀର ପୂଜାପଞ୍ଚତି ତୋମାର ନିଜ ଅଭିଜନତାର ଆଶୋକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ।

ପାଠ ୬ ଓ ୭ : ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀର ପୁରୁଷାଙ୍ଗଳି, ପ୍ରଣାମମତ୍ତ୍ଵ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାର ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଭାବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀର ପୁରୁଷାଙ୍ଗଳି

ଓ ନମଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବତୂତାନାଂ ବରଦାସି ହରିତିଯେ ।

ଯା ଗତିତ୍ୱତ୍ ପ୍ରମାନାନାଂ ସା ମେ ଭୂଯାଧୂଦର୍ଚନାନାଂ ।

ସମ୍ମାର୍ଥ : ହେ ହରିପିଯା, ତୁମି ସକଳକେ ବର ଦିଯେ ଥାକ । ତୋମାର ଆଶିତଦେର ସେ ଗତି ହୁଏ, ତୋମାର ଅର୍ଚନାର ଦ୍ୱାରା ଆମାରେ ସେଇ ତା ହୁଏ । ତୋମାକେ ନମସ୍କାର ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀର ପ୍ରଣାମମତ୍ତ୍ଵ

ଓ ବିଶ୍ୱରୂପ୍ୟ ଭାର୍ଯ୍ୟାସି ପଞ୍ଜେ ପଞ୍ଜାଲମେ ଶୁଭେ ।

ସର୍ବତଃ ପାହି ଯାଏ ଦେବି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମୋହସତ୍ୱତେ ।

ସମ୍ମାର୍ଥ : ହେ ଦେବୀ କଳ୍ପନା, ବିଶ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁର ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁମି ପଢା ଓ ପଢାର ଆଶୀର୍ବାଦ । ସକଳକେ ଶୁଭକଳ ଦାଓ । ତୁମି ଆମାକେ ସକଳକେତେ ରକ୍ଷା କରୋ । ଆମି ତୋମାକେ ପ୍ରଣାମ କରି ।

ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାର ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଭାବ

ପ୍ରତିଟି ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା କରା ହୁଏ । ପ୍ରତି ସଞ୍ଚାରେ ବୃଦ୍ଧତିବାରେ ଏବଂ ଆଖିନ ମାସେର ଶୁକ୍ଳ ପଦେର ପୂର୍ଣ୍ଣମାତିଥିତେ ବିଶେଷ ଆୟୋଜନେର ମଧ୍ୟମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା କରା ହୁଏ, ଯା ହିନ୍ଦୁସମାଜେର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପଦାଯେର ମଧ୍ୟେ

ଏକାଅତାବୋଧେର ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀ ଧନ-ସମ୍ପଦ ଦାନ କରେନ । ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀର ଉପର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ । ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀର ଶାନ୍ତ ସଭାବ ପୂଜାରିକେତେ ଶାନ୍ତ କରେ ତୋଳେ ।

ଦୀର୍ଘ କାହିଁ : ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାର ଆର୍ଦ୍ଦସାମାଜିକ ଓ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ
ଚିହ୍ନିତ କର ।

ପାଠ ୮ : ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦେବେର ପରିଚଯ ଓ ପୂଜାପଞ୍ଚତି
ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦେବେର ପରିଚଯ : ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଶିଳୀ ଓ ଭାସକର୍ମ ଏବଂ ଯତ୍ନ ଓ ସତ୍ରକୋଶରେ ଦେବତା । ଏ ମହାବିଶ୍ୱେର ପ୍ରଥାନ ହୁଏ । ଶିଳାନୈପୁଣ୍ୟ, ହାପତ୍ୟଶିଳ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିତେ ଅନନ୍ୟ ଗୁଣଶାଲୀ ଦେବତା ତିନି । ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ତିନି ଦେବଶିଳୀ । ତିନି ହାପତ୍ୟ ବେଦ ନାମେ ଏକଟି ଉପବେଦେର ରଚ୍ୟିତା । ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଦେବେର ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୌର୍ବଶାଳୀ । ତୀର ବାମ ଦିକ୍ରେ ଏକ ହାତେ ଧନୁକ



আর অন্য হাতে তুলাদণ্ড এবং ডান দিকের এক হাতে হাতুড়ি অন্য হাতে ব্রহ্ম কৃষ্ণ। তাঁর বাহন হস্তী। তাঁর কৃপায় মানুষ শিল্পকলা ও যাত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে। তিনি অলংকার শিল্পের স্তর্কা এবং দেবতাদের বিমান ও অস্ত্রনির্মাতা। তিনি ব্রহ্মার নির্দেশে কিষিকন্ধ্যে নগরী, যম ও বরুণদেবের প্রাসাদ, পুষ্পরথ, ইন্দ্রের বন্ধ, শিবের ত্রিশূল, ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র, কুবেরের অস্ত্র ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে তিনি ঘারকাপুরীও নির্মাণ করেছেন।

বিশ্বকর্মা পূজাগুরুত্ব

সর্বপ্রকার কারুকার্য বিশ্বকর্মা দেবের সৃষ্টি। বিশ্বকর্মা মানুষকে শৈলিক জ্ঞান ও মেধা দান করেন। বিশ্বকর্মা পূজার মূল উদ্দেশ্য তাঁর কৃপা এবং কর্মে শিল্পনৈপুণ্য লাভ করা। কারুশিল্প ও শিল্পশুমিকেরা ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি তিথিতে বিশ্বকর্মার পূজা করে থাকেন। পূজার রীতিনীতি অন্যন্য পূজার অনুরূপ হলেও পূজার সময় পারিবারিক সদস্যগণ যেসকল পেশায় নিয়োজিত সেসব পেশায় ব্যবহৃত উপকরণসমূহ বিশ্বকর্মা প্রতিমার কাছে রাখা হয়। বিশ্বকর্মা পূজা পঞ্চপঞ্চারে, দশপঞ্চারে বা ষোড়শপঞ্চারে করা যেতে পারে।

একক কাজ : বিশ্বকর্মা দেবের পরিচয় দাও।

পাঠ ৯ ও ১০ : বিশ্বকর্মা পূজার পুষ্পাঞ্জলি, প্রণামমন্ত্র এবং বিশ্বকর্মা পূজার শিক্ষা ও এর প্রভাব।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

এব সচস্দন দূর্বাগুৰুবিষ্পত্রাঞ্জলিঃ
ওঁ শিল্পবতে শ্রীবিশ্বকর্মণে নমঃ।

সরলার্থ: চন্দন, দূর্বা, পুষ্প ও বিল্পত্র দিয়ে শিল্পদেবতা বিশ্বকর্মাকে এ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করছি এবং প্রণাম জানাচ্ছি।

প্রণামমন্ত্র

ওঁ দেবশিল্পি মহাভাগ দেবানাং কার্যসাধক।
বিশ্বকর্মন্মস্তুত্যৎ সর্বাভীষ্ট ফলপ্রদঃ।

সরলার্থ: হে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা, আপনি মহান, দেবগণের কার্যসম্পাদক, সর্ব অভীষ্ট পূরণকারী। তোমাকে প্রণাম।

বিশ্বকর্মা দেবের পূজার শিক্ষা ও প্রভাব

- বিশ্বকর্মার কৃপায় শিল্প ও বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ কার যায়। তাঁর আশীর্বাদে কারুশিল্পকর্মে দক্ষতা অর্জন করা যায়। পারিবারিক ও মন্দিরভিত্তিক এ পূজা করার মাধ্যমে বিশ্বকর্মা দেবের প্রতি পূজারিদের ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বকর্মা পূজার মধ্য দিয়ে শিল্পের বিকাশ ঘটানোর প্রেরণা পাওয়া যায় এবং সৃষ্টি প্রতিভার বিকাশ ঘটে।
- পূজারিগণ স্ব কাজে মনোযোগী হয় এবং কার্যসম্পাদনে শৈলিক মনোভাবে গড়ে উঠে।
- বিশ্বকর্মার কৃপায় পূজারিগণ শিল্পকলা ও যাত্রিক বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করতে পারে।
- বিশ্বকর্মা পূজার মধ্য দিয়ে লোকশিল্পের বিকাশ ঘটে।

দলীয় কাজ : বিশ্বকর্মা দেবের পূজা করার কয়েকটি কারণ উল্লেখ কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. পূজামন্ত্র পাঠ পূজা করার একটি দিক।
২. যে কোনো পূজার আগে পূজা করতে হয়।
৩. স্বত্ত্বাচন বলতে বোঝানো হয়।
৪. সর্বপ্রকার কারুকার্য দেবের সৃষ্টি।
৫. স্থাপত্যবেদ নামে একটি উপবেদের রচয়িতা।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:

বাম পাশ	ডান পাশ
১. পূজা করতে পূজাবিধি	লক্ষ্মীপূজা করা হয়
২. ধূপ সৌরভ সৃষ্টি করে	অত্যন্ত শৌর্যশালী
৩. প্রতি বৃহস্পতিবার	শিঙের বিকাশ ঘটে
৪. বিশ্বকর্মা দেবের চতুর্ভূজ রূপ	মনের পবিত্রতা আনয়ন করে
	অনুসরণ করতে হয়

নিচের প্রশ্নগুলোর সঞ্চেপে উত্তর দাও :

১. পূজার সময় কীভাবে আসন শুন্ধি ও আচমন করা হয় ?
২. ‘শ্রীশ্রীলক্ষ্মী সম্পদ, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবী’-ব্যাখ্যা কর।
৩. শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবীর পূজার আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব চিহ্নিত কর।
৪. বিশ্বকর্মা দেবের পূজা কীভাবে করা হয় ?

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ‘পূজা-পার্বণে পূজাবিধিগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম’ – বিশ্লেষণ কর।
২. পারিবারিক ও সমাজজীবনে লক্ষ্মীপূজার শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ কর।
৩. ‘শিঙ্গনেপুণ্য সৃষ্টিতে অনন্য গুণশালী দেবতা বিশ্বকর্মা’ – বিশ্লেষণ কর।
৪. পারিবারিক ও সমাজজীবনে বিশ্বকর্মা দেবের পূজার শিক্ষা ও প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পূজার উপচার হিসেবে কোনটি শক্তির প্রতীক ?

ক. ধূপ	খ. পৃষ্ঠ
গ. প্রদীপ	ঘ. নৈবেদ্য

নিচের ফোনটি সঠিক ?

- ক) i ও ii
গ) ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রতিতিদের বাড়িতে প্রতিবছর আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতিথিতে বিশেষ পূজা করা হয়। প্রতিতিউ তার মায়ের সাথে উপবাস থেকে এ পূজা করে। এ উপলক্ষে তাদের বাড়িতে বন্ধু-বান্ধব, আতীয়-স্বজনের সমাগম ঘটে এবং এক আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

৪. প্রতিতি কোন দেব-দেবীর পূজা করে ?

৫. প্রতিতি উক্ত দেব-দেবীর পূজা করে লাভ করবে –

- i. শান্তস্বত্ত্বাব
 - ii. ধনসংরক্ষণ
 - iii. শিল্পনেপুণ্য

ନିଚ୍ଚେର କୋଣଟି ସଠିକ ?

- ক) i ও ii
গ) ii ও iii

সুজনশীল প্রশ্ন

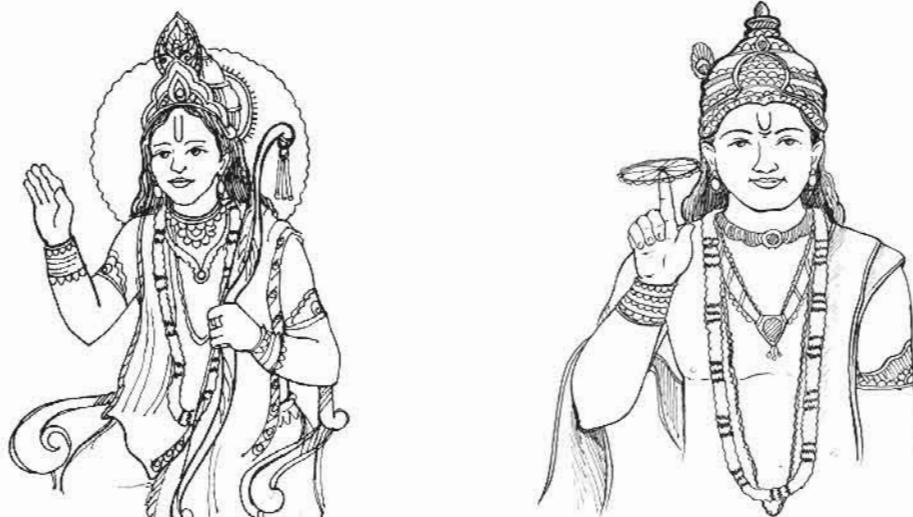
১. অবনীবাবু দা, বটি, কঁচি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি এ পেশায় দক্ষতা অর্জন ও কৃপালভের আশায় প্রতিবছর পরম ভক্তিতে পঞ্চগোপচারে এক বিশেষ দেব-দেবীর পূজা করেন। এ পূজায় তার পেশায় ব্যবহৃত উপকরণসমূহ প্রতিমার কাছে রাখেন। তার উপলক্ষ্মি পেশাগত পারদর্শিতা লাভ এবং কর্মের সনাম সবই এ পূজায় পরম ভক্তির ফল।

- ক. পূজা শব্দের অর্থ কী ?
খ. পূজার একটি বিধি ব্যাখ্যা কর।
গ. অবনীবাবু প্রতিবছর পরম উক্তিতে কোন দেব-দেবীর পূজা এবং কীভাবে করেন তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. অবনীবাবুর ব্যক্তিজীবনে উক্ত পূজার শিক্ষা ও প্রভাব মূল্যায়ন কর।

ষষ्ठ अध्याय

धर्मीय उपाध्याने नैतिक शिक्षा

धर्मग्रन्थ तत्त्व ओ तथ्येर माध्यमे धर्म ओ नैतिक शिक्षा प्रदान करेण। उपाध्यानेर माध्यमे सेइ शिक्षार प्रयोगेर दृष्टान्तं देया हयेहे। पूर्ववती शेषिते आमरा धर्मीय उपाध्यानेर साथे नैतिक शिक्षार सम्बन्धं निये आलोचना करेहि। सत्यवादिता, कृमा, जीवसेवा, कर्तव्यनिष्ठा, आत्मप्रेम इत्यादि नैतिक शिक्षार धारणा एवं ए सम्पर्कित दृष्टान्तमूलक उपाध्यान ओ तार शिक्षा सम्बन्धे जेनेहि। एथन आमरा सतता, कर्तव्य निष्ठा ओ त्यग-तितिक्षा – ए नैतिक मूल्यबोधेर धारणा एवं प्रासङ्गिक धर्मीय उपाध्यान ओ तार शिक्षा सम्बन्धे जानव।



ए अध्याय शेषे आमरा-

- हिन्दुधर्मेर आलोके सतता, कर्तव्यनिष्ठा ओ त्यग-तितिक्षार धारणा व्याख्या करते पारव
- सतता, कर्तव्यनिष्ठा ओ त्यग-तितिक्षार दृष्टान्तमूलक उपाध्यान वर्णना करते पारव
- उपाध्याने वर्णित छटनार शिक्षा व्याख्या करते पारव
- सं जीवन परिचालनार गुरुत्व वर्णना करते पारव
- सं जीवन प्रणालीर अभ्यास गठने परिवारेर भूमिका मूल्यायन करते पारव
- व्यक्ति ओ समाजजीवने सतता, कर्तव्यनिष्ठा ओ त्यग-तितिक्षार गुरुत्व उपलक्षि करे सं जीवन-यापने उम्रुक्त हव

पाठ १ : सतता

‘सतता’ मानव चरित्रेर एकटि विशेष महत्त्वण। ‘सं’ शब्द थेके ‘सतता’ शब्देर उৎपत्ति। ए शब्द याँर थाके तिनि समाजे विशेषताबे परिचित हये थाकेन। ‘सतता’ आसले कोन एकक शब्द नय। कतकलो शब्देर समाप्ति मात्र। एसब शब्देर मध्ये आছे सत्यनिष्ठा, आत्मरिकता, स्पष्टवादिता, सदाचार, सोत इनता प्रत्यक्ति। कोन अन्याय वा अवैध काज ना करार नामहि ‘सतता’। यिनि सत्येर पूजारी, सत्य कथा बलेन, सं पथे चलेन, कथनो सत्यके गोपन करेन ना, मिथ्याके प्रश्न देन ना तिनि ‘सतता’ शब्दे शपास्ति। सतता धर्मेर अज। सतताहि मानुषके अन्य मानुषेर निकट विश्वस्त करे तुले। सततार शब्दे इ मानुष समाजे हिन्दु धर्म-७म फर्मा-६

মহান বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। সততাই মানুষকে পৌছে দিতে পারে তার সফলতার দ্বারপ্রাণ্তে। সততা মানব জীবনে শান্তি ও স্বস্তি এনে জীবনকে করে তোলে আলোকিত ও মহিমাশৃঙ্খিত। যে সকল গুণ মানুষকে মহৎ, পুণ্যবান ও আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে তাদের মধ্যে সততার গুরুত্ব সর্বাধিক। সততা মানুষকে নিয়ে যায় মর্যাদার পথে, গৌরবময় স্থানে। সততা মানব চরিত্রের অলঙ্কার। সততার বিপরীত অসততা। অসৎ ব্যক্তি কখনো সমাজের মঙ্গল সাধন করতে পারেনা। কারণ তার মন কালিমা লিঙ্গ। সে অন্ধকার জগতের বাসিন্দা। সে সমাজে হিংসা-দ্বেষ ছড়িয়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করে থাকে। যার ফলে সমাজে ও রাষ্ট্রে শান্তি বিল্লিত হয়। এ ধরণের মানুষকে সকলেই ঘৃণা করে।

একক কাজ : সততা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী ?

পরবর্তী পাঠে আমরা সততা সম্পর্কে একটি উপাখ্যান বর্ণনা করব।

পাঠ ২ : উপাখ্যান - সততার পুরক্ষার

ছেলেটির নাম তৃণীর। গ্রামের এক দরিদ্র মাতা পিতার একমাত্র সন্তান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পিতা মাতাকে হারিয়ে সে অনাথ হয়ে পড়ে। অর্থাভাবে পড়ালেখা তেমন করতে পারেনি। গ্রামে কাজ কর্মের খুবই অভাব। তাই একদিন সে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে কাজের সন্ধানে। শহরে এসে হাঁটতে হাঁটতে একটি দোকানে এসে দোকানদারকে বলল, “কাকু, আমি খুব তৃষ্ণার্ত। আমাকে এক গ্লাস জল দেবেন?”

দোকানদারের নাম দয়াল বসাক। তিনি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, “এখানে বস, তোমার নাম কী? কোথায় থাক?” দোকানদারের কথায় সে বসল এবং বলল, “আমার নাম তৃণীর। অনেক দূরের গ্রাম থেকে এসেছি কাজের সন্ধানে।” দোকানদার তাকে এক গ্লাস জল দিয়ে আলাপচারিতা সেরে কী যেন ভেবে হঠাতে বললেন, “তুমি এখানে একটু বসে থাক। আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।” তৃণীরকে দোকানে বসিয়ে দোকানদার বেরিয়ে গেল। তৃণীর দোকানে বসে দোকান পাহাড়া দিতে লাগল। কিন্তু অনেক সময় হয়ে গেল দোকানদার ফিরে আসছেন। এখন সে কী করবে? দোকান ফেলে কোথাও যেতেও পারেনা। এরই মধ্যে কয়েকজন ক্রেতাও এসেছে শাড়ী কিনতে। শাড়ীর গায়ে দাম লেখা ছিল। তাই শাড়ী বিক্রি করতে তৃণীরের কোন অসুবিধা হল না। কারণ বাবার সাথে তৃণীর ছোট বেলায় হাটে বাজারে কাপড় বেচা কেনা করেছে। সারাদিনে সে বেশ কয়েকটি কাপড় বিক্রি করল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সঙ্গে হয়ে গেল। কিন্তু দোকানদারের দেখা নেই। উপায়ান্তর না দেখে তৃণীর দোকান বন্ধ করে সেখানে রাত কাটাল।

দলগত কাজ : তৃণীর দোকান ত্যাগ করে চলে গেল না কেন ?

পরের দিনও দোকানদার এলেন না। তৃণীর আর কী করে? সে দোকান খুলে বসে রইল। সারাদিন দোকানে সে কাপড় বিক্রি করে কাটাল। দোকানদার সেদিনও ফিরে এলেন না। এভাবে দিন যায়, মাস যায়। কিন্তু দোকানদার আর ফিরে এলেন না। উপায়ান্তর না দেখে তৃণীর দোকান চালাতে লাগল। আর দোকানদারের জন্য অপেক্ষায় রইল। ব্যবসায়ী মহলে তার যথেষ্ট নামতাকও হয়েছে। সকলেই তাকে

সম্মান করে। তার চারটি দোকান, অনেক কর্মচারী কাজ করে। সে দোকানগুলোর দেখাশুনা করে। কর্মচারীদের বেতন দেয়, দোকানের হিসেব পত্র দেখে। সে এখন খুবই ব্যস্ত।

একদিন তৃণীর দোকানের গাদিতে বসে আছে। এমন সময় দেখে এক বৃক্ষ লোক লাঠিতে ভর করে তার দোকানের সামনে এসে তৃণীরকে খুঁজছে। তার পরনে ছেঁড়া ময়লা কাপড়। শরীর খুবই দুর্বল ও বুঝ। দেখে তাকে ভিক্ষুক বলেই মনে হয়। কিন্তু তৃণীর তার দিকে তাকিয়ে তাকে চিনতে পারল। সে তাড়াতাড়ি গদি থেকে নেমে তার কাছে গেল। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, “কাকু, আমাকে চিনতে পরেননি? আমি তৃণীর। আমি এতদিন ধরে আপনার দোকান পাহাড়া দিয়ে আসছি। দোকান ছেড়ে কোথাও যাইনি। দোকানের আয় দিয়ে আরও ব্যবসা বাড়িয়েছি। আপনার কোন ক্ষতি হতে দেইনি। আপনি এসেছেন তাই এবার আমার ছুটি। আপনি আপনার দোকান বুঝে নিন।” বৃক্ষ দোকানদার তৃণীরের সততায় মুক্ষ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। তিনি বললেন, “না তৃণীর, আমার আর কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। এ সবই তোমার। আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এখন তুমি ছাড়া এ জগতে আমার কেউ নেই।”

তিনি বললেন, “সেদিন তোমাকে দোকানে রেখে বাইরে গিয়ে সংবাদ পেলাম আমার স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়। তাই দ্রুত বাড়ি চলে যাই। গিয়ে দেখি আমার স্ত্রী মারা গিয়েছে। তার কয়েকদিন পর ছেলে মেয়ে দু'টোও মারা যায়। তারপর সংসারের ঝামেলার মধ্যে আর থাকতে ইচ্ছে করল না। আশ্রমে আশ্রমে থাকি, তাই তোমার আর কোন খোঁজ খবরও নিতে পারিনি। কিছু হারিয়েও আমি ইশ্বরের কৃপায় ভালো আছি। হঠাৎ তোমার নামটা মনে পড়ল, তাই ছুটে এলাম। তোমাকে খুঁজে পাব একথা ভাবিনি। তোমাকে এ অবস্থায় দেখে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে তা বলে বুঝাতে পারব না। তুমি আমার দোকান রক্ষা করেছ, আবার আমাকে দেখেই চিনতে পেরেছ এবং দোকান আমাকে দিতেও চেয়েছ। এটা কয়জন করে? তুমি মানুষ নও, তুমি দেবতা। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি তুমি আরও অনেক বড় হবে।” তৃণীর বলল, “কাকু - আপনি আমার পিতার মত। আপনি আমাকে বিশ্বাস করে দোকান ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলেন। আমি সে বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করতে পেরেছি। এটাই আমার সাজ্জনা। আমি এর বেশি আর কিছু চাই না।” দয়াল বসাক বললেন, “বাবা তৃণীর! তুমি যা করেছ, তা কয়জন করে? সকলেই নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অন্যকে ঠকাতে চায়। আর তুমি আমার সেই ছোট দোকান শুধু রক্ষাই করিনি, তার আয় থেকে উন্নতি করে আরো ব্যবসা বাড়িয়েছ। এ সবই তোমার। এটাই তোমার পুরস্কার। তুমই এর প্রকৃত মালিক।” কিন্তু তৃণীর তার গ্রামে ফিরে যেতে চাইলেও দয়াল বসাক আর তাকে ছাড়েননি।

উপাখ্যানের শিক্ষা : জীবনকে সার্থক করে গড়ে তোলার জন্য সততা একটি উৎকৃষ্ট পথ। সততা না থাকলে মানুষ আর পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সততা মানুষকে ভালমন্দের পার্থক্য চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। সৎ মানুষকে সকলেই শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। এ বিশ্বে যত মহাপুরুষ জন্মাইছেন, তাঁরা সকলেই সততার ধারক ও বাহক। সততার জন্য তাঁরা নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিবাদোধ করেন নি। সত্য প্রকাশ করাই তাঁদের জীবনের ব্রত।

সৎ-এর বিপরীত হল অসৎ। যিনি অসৎ তিনি সত্যকে গোপন করেন। মিথ্যাকে আশ্রয় করে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে চান। ধর্মাধর্ম, ন্যায়-অন্যায় বিচার করেন না। সাময়িকভাবে তিনি সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারলেও তা কখনো চিরস্থায়ী হয় না। কারণ মিথ্যা ক্ষণস্থায়ী। মানুষ তাকে কখনো ভালোবাসেনা, শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। সকলেই তাকে ঘৃণা করে, এড়িয়ে চলতে চায়। কেউ তাকে বিশ্বাস করে না।

তাই আমরা কখনো অসৎ পথে চলব না, অন্যায় কাজ করব না। সকলে সৎপথে চলব, সত্য কথা বলব এবং উপাখ্যানের তৃণীরের মত সততার সাথে সকল কাজ করব। সবসময় মনে রাখব যে, ‘সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি’।

একক কাজ : তোমার মতে কেন সততাকে সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলা হয়?

পাঠ ৩ : কর্তব্যনিষ্ঠা

আমরা আমাদের পরিবারে ও সমাজে নানা রকমের কাজ করে থাকি। আমাদের মধ্যে যারা শিক্ষার্থী, তাদের কাজ হবে - ভালো করে লেখাপড়া করা এবং জ্ঞান অর্জন করা। যাঁরা চাকরি করেন, তাঁদের নিজেদের কাজ যত্নের সঙ্গে করতে হয়।

যার যে-কাজের দায়িত্ব, তাকে সে-কাজ করতে হবেই। একেই বলে কর্তব্য। আর কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও গভীর মনোযোগ থাকাকে বলে কর্তব্যনিষ্ঠা। সুতরাং ‘কর্তব্যনিষ্ঠা’ শব্দটির মানে হলো নিজের করণীয় কাজের প্রতি গভীর মনোযোগ। কর্তব্যনিষ্ঠা একটি নৈতিক গুণ এবং ধর্মের অঙ্গ।

পড়ালেখা করে জ্ঞান অর্জন করা শিক্ষার্থীর কর্তব্য। আমি শিক্ষার্থী। আমি মন দিয়ে পড়ালেখা করলাম না। তার ফল কী হবে? আমি পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারব না। প্রকৃত জ্ঞানও অর্জন করতে পারব না। তাই কর্তব্য পালন না করলে নিজের ক্ষতি হয়।

সমাজেও মানুষকে নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করতে হয়। সে কর্তব্য পালনে কেউ অবহেলা করলে, তাতে গোটা সমাজেরই ক্ষতি হয়। মোটকথা, কর্তব্যনিষ্ঠা ব্যক্তির চরিত্রকে উন্নত করে, তার মঙ্গল করে এবং এতে সমাজেরও উপকার হয়। কারণ ব্যক্তি নিয়েই তো সমাজ।

মহাভারত থেকে কর্তব্যনিষ্ঠার একটি উপাখ্যান সংক্ষেপে বলছি:

পাঠ ৪ : আরঞ্জির কর্তব্যনিষ্ঠা

অনেক অনেক কাল আগের কথা। শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে গিয়ে থাকত। পড়ালেখা শেষ করে নিজেদের বাড়িতে ফিরে যেত। শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহকে নিজেদের বাড়ির মতোই মনে করত। গুরুও শিক্ষার্থীদের নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। এমনি এক শিক্ষার্থী ছিলেন আরঞ্জি। তাঁর গুরু ছিলেন ঋষি ধৌম্য। তখন বর্ষাকাল। বর্ষার জলের তোড়ে মাঠে ঋষি ধৌম্যের একখন্দ জমির আল ভেঙে গিয়েছিল। ঋষি ধৌম্য আরঞ্জিকে বললেন : ‘যাও জমিটার আল বেঁধে এসো।’ আরঞ্জি মাঠে গেলেন জমির আল বাঁধতে। কিন্তু জলের কী তীব্র বেগ!

কিছুতেই আরঞ্জি আল বাঁধতে পারলেন না। তখন নিজেই শুয়ে পড়ে জলের তোড় ঠেকালেন। এদিকে দিন পেরিয়ে নামল সন্ধ্যা। ঋষি ধৌম্যের অন্য শিক্ষার্থী সব ফিরে এসেছেন। কিন্তু আরঞ্জির দেখা নেই। চিন্তিত ঋষি ধৌম্য। তিনি অপর দুই শিষ্য উপমন্ত্র আর বেদকে নিয়ে গেলেন সেই জমির কাছে। আরঞ্জির নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতেই আরঞ্জি ওঠে এলেন। জানালেন, তিনি নিজে শুয়ে পড়ে জমির ভেতর জল

চোকা বন্ধ করেছেন। আরুণিকে যে কাজ দেওয়া হয়েছিল, আরুণি তা যত্নের সঙ্গে পালন করেছেন। আরুণির কাজের প্রতি এই যে মনোযোগ, এরই নাম কর্তব্যনিষ্ঠা।

ঋষি ধৌম্য খুব খুশি হলেন। আরুণি তার কর্তব্যনিষ্ঠার গুণে বিখ্যাত হয়ে রইলেন। আমরাও আরুণির মতো হব। অর্জন করব কর্তব্যনিষ্ঠার মতো নৈতিক গুণ।

উপাখ্যানের শিক্ষা

কর্তব্যনিষ্ঠা ব্যক্তির চরিত্রকে মহৎ করে। তার মঙ্গল করে। আরুণির কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁর চরিত্রকে মহৎ করেছে। তিনি কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য গুরুদেবের প্রিয়পাত্র হয়েছেন। সকলের কাছে সম্মানিত হয়েছেন। স্থাপন করেছেন কর্তব্যনিষ্ঠার এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। আমরাও আরুণির মতো কর্তব্যনিষ্ঠ হব।

একক কাজ : উপাখ্যানের আলোকে তোমার গুরুজনের প্রতি যে সকল দায়িত্ব পালন করবে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ ৫ : ত্যাগ-তিতিক্ষা

সাধারণত ত্যাগ বলতে কোনো কিছু বর্জন বা পরিহার করা বোঝায়। কিন্তু বিশেষভাবে ত্যাগ বলতে বোঝায় নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া। নিজের সুখ বা লাভের চিন্তা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। ভোগ বা সুখের ইচ্ছা পরিহার করাকেই ত্যাগ বলে। ত্যাগ মানবচরিত্রের একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। ত্যাগ ধর্মেরও অঙ্গ। ত্যাগী ব্যক্তি সমাজে আদরণীয় হয়। তাঁকে সকলে শুন্দৰ করে। ত্যাগ ছাড়া ধর্ম হয় না। ভোগের কোনো শেষ নেই। যতই ভোগ করা যায়, ভোগের লালসা ততই বেড়ে যায়। ভোগের ইচ্ছাই মানুষকে লোভী করে তোলে। আর এই লোভ মানুষকে ধূঃসের মুখে ঠেলে দেয়। সমাজে ডেকে আনে হানাহানি, হিংসা ও বিদেশ। ত্যাগ মানুষকে করে মহান, সমাজে এনে দেয় শান্তি। হিন্দুধর্মের গ্রন্থসমূহে তত্ত্ব, তথ্য ও উপাখ্যানে ত্যাগের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে।

তিতিক্ষাও ত্যাগের মতো আরেকটি বিশেষ গুণ। তিতিক্ষা বলতে বোঝায় সহিষ্ণুতা। তিতিক্ষাও ধর্মের অঙ্গ। নৈতিকতা গঠনে তিতিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিতিক্ষা সমাজে শান্তি আনয়ন করে। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে গড়ে তোলে সৌহার্দ্যের মনোভাব। তিতিক্ষা না থাকলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংঘাত অনিবার্য। সকলে মিলে, পরস্পর পরস্পরের মতের ও চিন্তার প্রতি সহিষ্ণু হয়েই মানুষ সমাজ গঠন করেছে। সহিষ্ণু না হলে সুস্থুতাবে সামাজিক কাজকর্ম করা অসম্ভব। তাই কফ্ট সহ্য করার ক্ষমতা না থাকলে ব্যক্তিজীবনেও উন্নতি করা যায় না। জীবনে সহিষ্ণুতার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই ত্যাগের পাশাপাশি সহিষ্ণুতা বা তিতিক্ষার কথা একই সাথে উচ্চারিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ ও তিতিক্ষা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তিতিক্ষা না থাকলে ত্যাগের ফলও বিনষ্ট হতে পারে।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে তিতিক্ষার অনেক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের ত্যাগ-তিতিক্ষার কাহিনী একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পাঠ ৬ ও ৭ : শ্রীরামচন্দ্রের ত্যাগ-তিতিক্ষা

শ্রীরামচন্দ্র রামায়ণের প্রধান চরিত্র। তিনি বিস্তুর অবতার। তিনি ত্রেতায়ুগে মানুষসূপে জনহৃষি করেছিলেন। মানুষ হয়েও চরিত্রগুণে দেবতার স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্র সেই দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছেন। মহাবীর হয়েও তিনি ছিলেন ক্ষমতালী। মহ৷ষ, উদারতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, প্রভৃতি ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ।

অযোধ্যার রাজা দশরথ। তাঁর তিন রানি। বড় রানি কৌশল্যা, মেঝে রানি কৈকৈয়ী, আর ছোট রানি সুমিত্রা। কৌশল্যার পুত্র রাম, কৈকৈয়ীর পুত্র ভরত, আর সুমিত্রার দুই পুত্র লক্ষণ ও শজল।



একক কাঞ্চ : তোমার জানা একজন ত্যাগী ব্যক্তির নাম এবং তাঁর ত্যাগের একটি দিক উল্লেখ কর।

নিয়মানুসারে পিতার অবর্তমানে বড় ছেলে যুবরাজ হতো। তারপর সে-ই শাস্তি করত রাজপদ ও ক্ষমতা। রামের ক্ষেত্রেও তাই হওয়াই স্বাভাবিক। রাম তখন পীটিশ বছরের যুবক। রাজা দশরথ বৃদ্ধ হয়েছেন। রামকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করবেন। অভিষেকে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। কিন্তু বাধা এল বিমাতা কৈকৈয়ীর কাছ থেকে। রাজা দশরথ একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কৈকৈয়ীর সেবাবদ্ধে তিনি সুস্থ হয়ে পড়েন। রাজা দশরথ খুশি হয়ে তাকে দুটি বর দিতে চাইলেন। কিন্তু কৈকৈয়ী বললেন, ‘মহারাজ, আমি এখন কিছুই চাই না। আমি সময় মতো চেয়ে নেব।’

এখন যেন সেই সময় উপস্থিত হলো। কৈকৈয়ী মন্ত্ররার পরামর্শ মতো রাজা দশরথের নিকট এমন দুটি বর প্রার্থনা করলেন, যা রাজা দশরথের জন্য হৃদয়বিদারক। কৈকৈয়ী চাইলেন, এক বরে রাম চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে যাবে, আর এক বরে তাঁর পুত্র ভরত রাজা হবে। রাজা দশরথের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। কৈকৈয়ীর কথায় তিনি বিমর্শ হয়ে পড়ে রইলেন। রামকে আনা হলো দশরথের কাছে। দশরথ রামকে সব বৃষ্টান্ত বললেন। তিনি পিতার সত্য রক্ষা করতে বনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি রাজ্য ত্যাগ করে, রাজপোশাক পরিত্যাগ করে বক্স পরিধান করলেন।

রাম সীতার সাথে দেখা করতে গেলেন। সীতা রামের সাথে বনে যেতে চাইলে সীতার কষ্ট হবে ভেবে তাঁকে সঙ্গে নিতে চাইলেন না। কিন্তু সীতা কোনো কথাই শুনলেন না। তিনি যাবেনই রামের সাথে। এদিকে লক্ষণও কারো বাধা না মেনে রামের সাথে বনে যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন। শেষে রামের সঙ্গে সীতা ও লক্ষণ বনে রওনা হলেন। রাম বনে যাওয়ার প্রাক্কালে নিজের ধনরত্ন এমনকি নিজের হাতিটি পর্যন্ত দান করে দিলেন। বনে যাওয়ার সময় সকলে যখন ভেঙ্গে পড়েছে, রাম তখন হাসিমুখে সমস্ত কষ্ট সহ্য করেছেন। তিনি পিতাকে বললেন, মাতার প্রতি দৃষ্টি রাখতে। নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নিতে।

রাম, সীতা ও লক্ষণ পায়ে হেঁটে চলতে চলতে অনেক পথ অতিক্রম করে চিরকূট পর্যন্তে এগেন। রাজ্যের দুষ্টাল সেখানে পর্ণকুটির নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। এখানে রাজভোগ নেই, খাদ্য বনের ফলমূল আর

ବନ୍ୟ ମୃଗ । ତରତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକେ ଫିରିଯେ ନିତେ ଏମେହିଲ । କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗୀ ରାମ ଫିରେ ଯାନନି । ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରର ପୁରୋ ଜୀବନଟାଇ ତ୍ୟାଗ-ତିତିକ୍ଷାର । ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରର ତ୍ୟାଗ-ତିତିକ୍ଷା ଅନୁସରଣୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ।

ଉପାଧ୍ୟାନେର ଶିକ୍ଷା : ମହାପୁରୁଷଦେର ତ୍ୟାଗ-ତିତିକ୍ଷାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାହିନି ଆମାଦେର ତ୍ୟାଗ-ତିତିକ୍ଷାୟ ଉଦ୍ଭୁତ କରେ । ତ୍ୟାଗ-ତିତିକ୍ଷାର ଗୁଣେ ମାନୁଷ ଦେବତାର ସତରେ ଉନ୍ନାତ ହତେ ପାରେ । ସେ ସକଳ ନୈତିକ ଗୁଣ ମାନୁଷକେ ସମାଜେ ଆଦର୍ଶ ହିସେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ସେଗୁଲୋର ମଧ୍ୟେ ତ୍ୟାଗ-ତିତିକ୍ଷା ଅନ୍ୟତମ । ତ୍ୟାଗ-ତିତିକ୍ଷା ମାନୁଷକେ ନିଯେ ଯାଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପଥେ, ଗୌରବମୟ ସ୍ଥାନେ । ତ୍ୟାଗ-ତିତିକ୍ଷା ମାନୁଷରିବ୍ରତେ ଅନ୍ୟତମ ମହେସୁମାନ । ତ୍ୟାଗୀ ମାନୁଷକେ ସକଳେଇ ଭାଲୋବାସେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ।

ନୃତ୍ୟ : ସଦାଚାର, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଗୁଣାନ୍ଵିତ, ଉପାୟାନ୍ତର, ମୃତ୍ୟୁଶୟା, ପ୍ରଜାବନ୍ଦସଲ, ତିତିକ୍ଷା, ମନୋରଞ୍ଜନ, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଏକାଗ୍ରତା ।

ପାଠ ୮ : ସଂ-ଜୀବନ ପରିଚାଳନାର ଗୁରୁତ୍ୱ

ସତତା, ସତ୍ୟବାଦିତା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଏକାଗ୍ରତା, ତ୍ୟାଗ ତିତିକ୍ଷା, ସହନଶୀଳତା, ସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରଭୃତି ମାନୁଷେର ବିଶେଷ ଗୁଣଗୁଲୋ ଯାର ମଧ୍ୟେ ଥାକେ ତାକେଇ ମାନୁଷ ସଂ ମାନୁଷ ବଲେ ଜାନି । ସଂ ମାନୁଷ କଥନେ କାରୋ କ୍ଷତି କରତେ ପାରେ ନା । ସେ ତାର ଆଲୋକିତ ଜୀବନ ଦିଯେ ସକଳେର ମନେର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରେ ।

ସମାଜେର ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାର ଜନ୍ୟ ତାର ନିଜେର ଜୀବନ ବାଜି ରେଖେ କାଜ କରେ ଥାକେ । ମେହେ-ଦୟା, ମାୟା-ମମତା ଦ୍ୱାରା ସକଳେର ମଙ୍ଗଳ କରତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ । ସମାଜ ଥେକେ ଯାତେ ଅନ୍ୟାୟ-ଅବିଚାର ଦୂର ହୁଁ, ସବଳ ଯାତେ ଦୂର୍ବଲେର ଉପର ଅଭ୍ୟାସ କରତେ ନା ପାରେ, ସେ ବ୍ୟାପାରେ ତାରା ସକଳକେ ସଚେତନ କରେ ତୋଳାର ଚେଷ୍ଟା କରେ । ସମାଜେ ଯଥନଇସ ସଂ ମାନୁଷେର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଁ, ତଥନଇସ ସମାଜ ହୁଁ ଓଠେ ଶାନ୍ତିର ଆଧାର, ମଙ୍ଗଳେର ମୋକ୍ଷଧାର । ସୁତରାଂ ଆମାଦେର ସକଳେର ମଙ୍ଗଳେର ଜନ୍ୟ ସମାଜେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଜନ୍ୟ, ଦେଶେର ଉନ୍ନତି ଓ ଶୃଜ୍ଵଳା ହ୍ୟାପନେର ଜନ୍ୟ ସକଳକେ ସଂ ଜୀବନେର ଅଧିକାରୀ ହତେ ହବେ । ସଂ ଜୀବନ ହ୍ୟାପନେର ମାଧ୍ୟମେ ସକଳେର ସାଥେ ଆତ୍ମବୋଧ, ସହମର୍ମିତା ଇତ୍ୟାଦି ଗଡ଼େ ତୁଳତେ ହବେ । ଆର ଏଭାବେଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁଶୃଜ୍ଵଳ ସମାଜ ଗଠନ ସମ୍ଭବ ହବେ ।

ସୁତରାଂ ବଲା ଯାଇ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ବିନିର୍ମାଣେ ସଂ ଜୀବନ ପରିଚାଳନା କରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ପାଠ ୯ : ସଂ-ଜୀବନ ପରିଚାଳନାୟ ପରିବାରେର ଭୂମିକା

ମାନୁଷ ଯଥନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ତଥନ ସେ ସଂ, ସୁଜନ ବା ଦୁର୍ଜନ ଇତ୍ୟାଦି କୋନ ଗୁଣାବଳି ନିଯେଇ ଜନ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ନା । ଜନ୍ୟେର ପର ପାରିବାରିକ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ପରିବେଶେର କାରଣେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣେର ସମାବେଶ ଘଟେ । ମାନୁଷ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦାସ । ମାନୁଷେର ମନେ ଦୁଃଖରଣେର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରଯେଛେ । ସଂ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଅସଂ ପ୍ରବୃତ୍ତି । ସଂ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଫଳେ ମାନୁଷ ଯେ କାଜ କରେ ତାକେ ସଂ କାଜ ବଲା ହୁଁ ଆର ଅସଂ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମାନୁଷ ସବ ସମୟ ଅସଂ କାଜ କରେ । ସଂ କାଜେର ଫଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂ ମାନୁଷଙ୍କପେ ଚିହ୍ନିତ ହୁଁ । ସକଳେ ତାକେ ଭାଲୋବାସେ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ । ଆର ଏସବ ଗୁଣାବଳି ଅର୍ଜନେ ପରିବାରେର ଭୂମିକାଇ ପ୍ରଧାନ । ପରିବାରେର କର୍ତ୍ତାବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସଦ୍ଗୁଣେର ଅଧିକାରୀ ହୁଁ ତାହଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟରାଓ ସଦ୍ଗୁଣେର ଅଧିକାରୀ ହୁଁ । ଯେହେତୁ ପରିବାରକେ ବଲା ହୁଁ ସମାଜେର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର । ସୁତରାଂ ଏସବକେ ସୁନ୍ଦର, ସୁଦୃଢ଼ କରତେ ପରିବାରେର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟକେ ଧୈର୍ୟ, ସଂସମ, ସହନଶୀଳତା, କ୍ଷମା, ସହମର୍ମିତା

প্রভৃতি গুণবলি অর্জনের সাথে সাথে হিংসা, দ্বেষ, লোভ, লালসা প্রভৃতি অসৎ আচরণগুলো বর্জন করে সৎ ও ন্যায়ের পথে নিজে চালিত করতে হবে।

একক কাজ : সততা ও সৎ জীবন সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী? কয়েকজন সৎ মানুষের নাম লিখ?

নতুন শব্দ : আন্তরিকতা, স্পষ্টবাদিতা, সদাচার, সত্যনির্ণয়, গুণান্বিত, উপায়ান্তর, মৃত্যুশয্যা, সিংহদরজা, বিসর্জন, প্রজাবৎসল, তিতিক্ষা, কীর্তিত, মনোরঞ্জন, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা, দ্বেষ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. তিতিক্ষার অপর নাম |
২. ভোগে মানুষের বৃন্দি পায়।
৩. অপরের কষ্ট দূর করার এক নাম |
৪. ত্যাগ মানুষের মনে এনে দেয়।
৫. অন্যের প্রতি হিন্দুধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:

বাম পাশ	ডান পাশ
১. নৈতিকতা গঠনে	ত্যাগ হয় না
২. তিতিক্ষা না থাকলে	সর্বদা শ্রদ্ধেয়
৩. ত্যঙ্গী মানুষ	সততার গুরুত্ব অপরিসীম নিজেকে সমৃদ্ধিশালী করাবার

নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষেপে উত্তর দাও

১. সততা বলতে কী বোঝায়? সততার দুটি উদাহরণ দাও।
২. লক্ষণ রামসীতার সাথে বনে গেলেন কেন?
৩. কৈকেয�ী রাজা দশরথের কাছে বর দুটি প্রার্থনা করলেন কেন?

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. ত্যাগ-তিতিক্ষা কাকে বলে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
২. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ত্যাগ-তিতিক্ষা কীভাবে শান্তি আনতে পারে – ব্যাখ্যা কর।

ବହୁନିର୍ବାଚନି ପ୍ରଶ୍ନ

1. ସୟଥିବିଷ୍ଣୁ କୋଣ ଯୁଗେ ରାମ ଅବତାରରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଁଛିଲେନ ?
 କ. ସତ୍ୟଯୁଗ ଖ. ଦ୍ୱାପରଯୁଗ
 ଗ. ତ୍ରେତାଯୁଗ ଘ. କଲିଯୁଗ

 2. ତ୍ୟାଗ ଓ ତିତିକ୍ଷା ଆଦର୍ଶେ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦାଇ –
 i. ପରିଶ୍ରମୀ
 ii. ସହିଷ୍ଣୁ
 iii. ଦୟାଲୁ
- ନିଚେର କୋଣଟି ସଠିକ ?**
- | | |
|-------------|----------------|
| କ. i | ଖ. ii |
| ଗ. ii ଓ iii | ଘ. i, ii ଓ iii |
1. **ସୂଜନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ**

ନୀଳରତନ ଓ ମନୋରମାର ବେଶ ସୁଖେଇ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ କାଟାଛିଲ । ବେଶ କରେକବରହ ହଲୋ ତାଦେର କୋନୋ ସନ୍ତାନାଦି ହଛେ ନା । ଡାଙ୍କାର ବଲେଛେ ତାଦେର ସନ୍ତାନ ହେଁଯାର କୋନୋ ସଞ୍ଚାବନା ନେଇ । ଏହିନ୍ୟ ତାଦେର ଦୁଃଖନେର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ହତାଶା ବିରାଜ କରଇଛେ । ବାଡ଼ିର କର୍ମଚାରୀ ଦୀନନାଥ ବ୍ୟାପାରଟି ଲଙ୍ଘ କରେ । ସେ ଦାରିଦ୍ର । ତାର ଦୁଟି ସନ୍ତାନ । ଦୀନନାଥ ଶ୍ରୀକେ ରାଜି କରିଯେ ତାର ଏକଟି ସନ୍ତାନକେ ମନୋରମାର କୋଳେ ତୁଳେ ଦେଇ । ମନୋରମା ନୀଳରତନରେ ସଂସାରେ ଶାନ୍ତିର ଆବହ ଫିରେ ଆସେ ।

 - କ. ରାମାୟନେର ପ୍ରଧାନ ଚାରିତ୍ର କେ ?
 - ଖ. ତିତିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମେ ସମାଜେ କୀଭାବେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଁ – ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ?
 - ଗ. ଦୀନନାଥେର ଚରିତ୍ରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରର କୋଣ ଦିକଟି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଁଛେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
 - ଘ. ମନୋରମା ଓ ନୀଳରତନରେ ସଂସାରେ ସୁଖେର ଆବହେର ମୂଳେ ରଯେଛେ ଦୀନନାଥେର ଭୂମିକା – ତୋମାର ପଠିତ ଉପାଖ୍ୟାନେର ଆଲୋକେ ମୂଲ୍ୟାଯନ କର ।

সপ্তম অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

জগতের সকল মানুষ এক রকম নয়। কেউ কেউ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সবসময় নিজের মঙ্গলের কথাই চিন্তা করে। এরা সাধারণ মানুষ। আবার কেউ কেউ আছেন এর বিপরীত। তাঁরা অপরের মঙ্গলের কথাও চিন্তা করেন। নিজের ক্ষতি হলেও অপরের মঙ্গল করেন। কেউ কেউ সৎসারের সুখ ত্যাগ করে জগতের মঙ্গল সাধন করেন। এঁরা হলেন মহাপুরুষ বা মহীয়সী নারী। এঁদের জীবনচরিতই আদর্শ জীবনচরিত। এঁদের জীবনী থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়তে পারি। এঁদের পথ অনুসরণ করে আমরাও জগতের মঙ্গল করতে পারি। এ অধ্যায়ে এরূপ ছয়জন মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীর বর্ণনা করা হলো। এঁরা হলেন – শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দ, মা সারদা দেবী, সাধক রামপ্রসাদ এবং প্রভু জগদ্বন্দু।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোরজীবনে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনায় প্রীতি, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, জীবপ্রেমসহ বিভিন্ন আদর্শিক দিকের বর্ণনা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে মা সারদা দেবীর জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে সাধক রামপ্রসাদের জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে প্রভু জগদ্বন্দুর জীবন ও শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের জীবনাদর্শের শিক্ষা নিজ জীবনচরণে মেনে চলতে উদ্দুক্ষ হব।

পাঠ ১, ২ ও ৩ : শ্রীকৃষ্ণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শৈশবেই অসুরদের হাত থেকে গোকুলের শিশুদের রক্ষা করেছেন। মথুরার অত্যাচারী রাজা কংস তাঁকে হত্যা করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পারেননি। তাঁর হাত থেকে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বাঁচিয়েছেন, গোকুলের অন্য শিশুদেরও বাঁচিয়েছেন। এতে কংস আরো হিস্ত হয়ে ওঠেন। তিনি গোকুলের লোকদের ওপর অত্যাচার আরো বাড়িয়ে দেন। তাই একদিন গোপেরা যুক্তি করে গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনে চলে যান। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামও সঙ্গে যান। সেখানে কৃষ্ণ হন গোপবালকদের দলপতি।

কিন্তু গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনে গেলে কী হবে? কংস কৃষ্ণকে মারবেনই। তাই তিনি একের পর এক অনুচর পাঠিয়েছেন বৃন্দাবনে। কৃষ্ণকে মারার জন্য। অনুচরেরা বিভিন্ন ছদ্মবেশে বৃন্দাবনে গেছে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দিব্য জ্ঞানবলে তা জানতে পেরে সবাইকে হত্যা করেছেন। ফলে তিনিও রক্ষা পেয়েছেন এবং অন্য গোপবালকেরাও রক্ষা পেয়েছে।

তাঁর বাল্য ও কৈশোরজীবনের কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো –

বৎসাসুর বধ

একদিন শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং অন্যান্য গোপবালকেরা গুরু চরাছিলেন। তখন কহসের এক অনুচর বাছুরের রূপ ধরে কৃষ্ণকে মারতে এলো। কেউ যাতে বুঝতে না পারে তাই সে গুরু-বাছুরের সঙ্গে মিশে গেল। কিন্তু কৃষ্ণ ঠিকই তাকে চিনতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বৎসাসুরের সেজ ও দু-পা ধরে জোরে এক গাছের উপর আছড়ে ফেলেন। ফলে বৎসাসুর মারা যায়।

বকাসুর বধ

বৎসাসুর মারা গেলে কহসে কৃষ্ণকে মারার জন্য বকাসুরকে পাঠালেন। একদিন গোপবালকেরা যমুনা নদীর তীরে খেলছিল। শ্রীকৃষ্ণও তাদের সঙ্গে ছিলেন। গোপবালকেরা নদীর তীরে প্রকাড় এক বক পাখি দেখতে পেল। কৃষ্ণ তার নিকট যেতেই বকাসুর তাঁকে ধাস করতে এগিয়ে এল। কৃষ্ণ তখন তার বিরাট ঠোটদুটো ধরে বিদীর্ণ করে ফেললেন। বকাসুর মারা গেল।

অঘাসুর বধ

অঘাসুর হলো পৃতনা রাক্ষসীর ভাই। কহস তাকে ডেকে বললেন, ‘কৃষ্ণ তোমার বোনকে হত্যা করেছে। তুমি এর প্রতিশোধ নাও।’ অঘাসুর সম্মত হয়ে বৃন্দাবনে চলে গেল।

একদিন কৃষ্ণসহ গোপবালকেরা এক বনের ধারে খেলছিল। অঘাসুর আগে থেকেই সেখানে গিয়ে অজগরের রূপ ধরল এবং বিরাট হী করে চূপচাপ পড়ে রইল। গোপবালকেরা বুঝতে পারেনি। তারা মনে করেছে কেনো গিরিগুহা হবে। তাই তারা অজগরের মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিন্তু কৃষ্ণ কাছে এসে বুঝতে পারলেন এ গিরিগুহা নয়। অজগরজন্মী কেনো অসুর। তখন তিনি অজগরের মুখের মধ্যে গিয়ে এমনভাবে দৌড়ালেন যে অজগরের শ্঵াস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। ফলে অঘাসুর মারা গেল এবং গোপবালকগণসহ কৃষ্ণ বৈঁচে গেলেন।

এভাবে কহস শ্রীকৃষ্ণকে মারার জন্য অরিষ্টাসুর, কেশী দানব ও ব্যোমাসুরকেও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের হাতে সকলেই মৃত্যু হয়। ফলে গোপবালকেরাসহ তিনিও রক্ষা পান।

একক কাজ : শ্রীকৃষ্ণ কেন বৎসাসুর ও বকাসুরকে বধ করেছিলেন?

এছাড়া এই বয়সে শ্রীকৃষ্ণ আরো অনেক জনহিতকর কাজ করেছেন। যেমন – কালীয় দমন, দাবাট্টি পান, শঙ্খচূড় বধ, গোবর্ধন ধারণ ইত্যাদি।

কালীয় দমন

গুরুডের ভয়ে কালিন্দী হৃদে আশ্রয় নিয়েছিল কালীয় নামে এক মহাবিষ্ণুর সাপ। তার বিষে হৃদের জল হয়ে গিয়েছিল বিষাঙ্গ। যে-কেউ ঐ হৃদের জল পান করলে তৎক্ষণাত মারা যেত।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদের সঙ্গে নিয়ে ঐ হৃদের পাড়ে খেলছিলেন। তখন তৃঞ্চার্জ হয়ে কয়েকজন বালক হৃদের জল পান করে। এতে তাদের মৃত্যু হয়। কিন্তু তগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ২৩ তারা জীবন ফিরে পায়। কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন, ২৪ নিচয়ই এই হৃদে বিষধর কোনো সাপ আছে।



তার বিষেই ত্রদের জল বিষাক্ত হয়েছে। তিনি তখন দিব্যজ্ঞানে কালীয় নাগের কথা জানতে পারেন। কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে জলে বাঁপ দেন। আর খাদ্য মনে করে কালীয় নাগ এসে কৃষ্ণকে পেঁচিয়ে ধরে। কৃষ্ণও এমনভাবে কালীয়ের গলা চেপে ধরেন যে তার প্রাণ যায় যায়। তখন কালীয় বুঝতে পারে ইনি সাধারণ লোক নন। স্বয়ং তগবান। তখন সে ক্ষমা প্রার্থনা করে। কৃষ্ণ তখনই তাঁকে হৃদ থেকে চলে যেতে বললেন। কালীয় তখন তার মূল আশ্রয় রমণক দ্বীপে ফিরে যায়। এরপর থেকে কালিন্দীর জল আবার পানের যোগ্য হয়।

একক কাজ : কালিন্দীর বিষাক্ত জল কীভাবে পানযোগ্য হয়ে ওঠে?

দাবান্তি পান

একদিন সকল গোপ মিলে যমুনার তীরে বনভূমিতে অবস্থান করছিলেন। হঠাতে বনে দাবানল ছুলে ওঠে। দাউ দাউ করে আগুন ছুলছে। পালাবার পথ নেই। সবাই বাঁচার জন্য হাহাকার করছে। কৃষ্ণ তখন সকলকে অভয় দেন। তিনি সকলকে শান্ত থাকার আহ্বান জানান। তারপর ঐশ্বরিক বলে তিনি সেই দাবানল পান করেন। ফলে দাবানল থেকে সকলে রক্ষা পায়।

গোবর্ধন ধারণ

একদিন সকল গোপ মিলে ইন্দ্রপূজার আয়োজন করেছেন। তা দেখে কৃষ্ণ নন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ইন্দ্রকে পূজা করছেন কেন, বাবা?’ নন্দ বললেন, ‘ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতা।’ তিনি বৃষ্টি দেন বলেই তৃণ, তরু-লতা ইত্যাদি জন্মে এবং বৃক্ষ পায়। তা থেয়ে আমাদের গাভীগুলো হষ্টপুষ্ট হয় এবং অনেক দুধ দেয়। তাই আমরা ইন্দ্রপূজা করছি।’ কৃষ্ণ বললেন, ‘এই গোবর্ধন গিরি তো তৃণ, তরু-লতা ইত্যাদি উৎপাদন করে। তা থেয়ে আমাদের গরুগুলো হষ্টপুষ্ট হয়। তাই আসুন আমরা গোবর্ধন গিরির পূজা করিব।’

কৃষ্ণ ইতিপূর্বে অনেক অসাধ্য সাধন করেছেন। অনেক বিপদ থেকে গোপদের রক্ষা করেছেন। তাই তাঁর কথা কেউ উপেক্ষা করতে পারলেন না। তখন সবাই মিলে বিবিধ উপচারে গোবর্ধন গিরির পূজা করলেন।

এদিকে প্রতিবারের মতো এবারও পূজা না পেয়ে দেবরাজ ইন্দ্র ক্ষেপে গেলেন। তিনি মেঘসমূহকে আদেশ দিলেন তুমুল বজ্র ও বৃষ্টিপাত ঘটাতে। শুরুহলো বজ্র ও বৃষ্টিপাত। সব ভেসে যেতে লাগল। গোপরা কান্নাকাটি শুরু করে দিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুল দ্বারা গোবর্ধন গিরিকে শূন্যে তুলে ধরলেন। সকল গোপ তাদের গরু-বাছুর এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে তার নিচে আশ্রয় নিল। তা দেখে ইন্দ্র বুঝতে পারলেন, স্বয়ং বিষ্ণু কৃষ্ণবাতাররূপে জন্ম নিয়ে এ কাজ করছেন। তখন তিনি লজ্জিত হয়ে কৃষ্ণের কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তারপর আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যায়। গোবর্ধন গিরি ধারণ করার জন্য কৃষ্ণের এক নাম হয় গিরিধারী।

শিক্ষা : শ্রীকৃষ্ণের জীবনী থেকে আমরা এই নৈতিক শিক্ষা পাই যে, ভগবান তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসেন। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্যই তিনি অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ভগবান হলেও তিনি মানুষের মতোই আচরণ করেন। তাদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করেন। তাদের মঙ্গলের জন্য সন্তুষ-অসন্তুষ্ট সব কাজই তিনি করে থাকেন। যে-কোনো বিপদ থেকে জীবকে রক্ষা করার জন্য তিনি সামনে এগিয়ে যান।

কৃষ্ণ তাঁর কৈশোরে বৎসরূপী অসুর, অজগরূপী অবাসুরকে বধ করে যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তা আমাদের সাহসী হতে উদ্বৃত্ত করে। কালীয় দমনের মধ্য দিয়ে বিশ্বাস্ত অপেয় জলকে সুপেয় করে তোলার মধ্য দিয়ে জনগণের উপকার করেছেন। আবার কালীয় নাগকে হত্যা না করে ক্ষমা করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমার আদর্শও স্থাপন করেছেন। দাবাট্টি পান ও গোবর্ধন ধারণের মধ্য দিয়ে সমাজের মঙ্গল সাধনের আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। তাই আমরা তাঁকে ভক্তি-শৃঙ্খলা করব এবং আমরাও তাঁর মতো অন্যের মঙ্গল সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

একক কাজ : ক. শ্রীকৃষ্ণের জীবপ্রেমের শিক্ষাগুলো চিহ্নিত কর।

খ. ন্যায় প্রতিষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা ঘটনার আলোকে মূল্যায়ন কর।

দলীয় কাজ : ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার প্রয়োগক্ষেত্র চিহ্নিত কর।

পাঠ ৪, ৫ ও ৬ : শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্য ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি তারতের পঞ্চমবঙ্গের নবদ্বীপে জন্মহণ করেন। তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতা শচীদেবী। জগন্নাথ মিশ্রের পৈতৃক নিবাস ছিল বালাদেশের শ্রীহট্টের (বর্তমান সিলেট) ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে। বিদ্যাশিকার জন্য তিনি নবদ্বীপ গিয়েছিলেন। নীলাম্বর চক্রবর্তীর কল্যা শচীদেবীকে বিয়ে করে তিনি সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

জগন্নাথ মিশ্রের দুই ছেলে – বিশ্বরূপ ও নিমাই। এই নিমাই-ই পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য বা চৈতন্যদেব নামে খ্যাত হন।

নিমাইয়ের অঙ্গ বিশ্বরূপ যৌবনে ঘর ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নিমাইয়ের বয়স ষাখন দশ-এগুর, তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। মা শচীদেবী কনিষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে খুব বিপদে পড়েন। বালক নিমাই ছিলেন খুবই চক্ষুল ও দুর্বল। তবে খুব মেধাবী। শচীদেবী তাঁকে গজাদাস পাঞ্জিরের চতুর্পাঠীতে ভর্তি করিয়ে দেন। তাঁর মেধা এবং ঝুঁপের কারণে সকলেই তাঁকে মেহ করতেন। পুরু গজাদাস এমন একজন ছাত্র পেয়ে খুবই খুশি। নিমাই স্বত্বাবে চক্ষুল ও দুর্বল হলে কী হবে? পড়াশুনার বেলায় ছিলেন খুবই নিষ্ঠাবান। তাই অন্ধকালের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, অলংকার, স্মৃতি ও ন্যায় শান্ত্রে অগাধ পাঞ্জিত্য অর্জন করেন। যেল বছর বয়সেই তিনি ‘পাঞ্জি নিমাই’ বলে সারাদেশে পরিচিত হয়ে ওঠেন। এ-সময় তিনি একটি টোল খুলে ছাত্র পড়াতে লাগলেন। অন্ধকালের মধ্যেই তাঁর অধ্যাপনার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পুত্রের এই খ্যাতিতে মা শচীদেবী খুবই খুশি। তাঁর মনে আনন্দের ধারা বইতে লাগল। তিনি ২৫ সিদ্ধান্ত নিলেন ছেলের বিয়ে দেবেন। কনেও ঠিক



হয়ে গেল। পঙ্গিত বস্তুভাচার্যের সুলক্ষণা কল্যাণ লক্ষ্মীদেবী। শচীদেবী তখন একটি অসাধারণ কাজ করলেন। তখনকার নিয়মানুযায়ী তিনি ছেলের বিয়েতে অনেক পণ নিতে পারতেন। কিন্তু পণপথার এই বিষবৃক্ষের মূলে তিনি কুঠারাঘাত করলেন। বিনা পণে তিনি ছেলের বিয়ে দিলেন।

একক কাজ : শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্যজীবন সম্পর্কে লেখ।

নিমাই যে কতবড় পঙ্গিত ছিলেন, তা একটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়। সে-সময় কাশীরে এক বিখ্যাত পঙ্গিত ছিলেন কেশব মিশ্র। তিনি কাশী, কাঞ্চী, নালদা প্রভৃতি স্থানের পঙ্গিতদের শাস্ত্রবিচারে প্রাপ্তিজিত করে একদিন নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হন। তিনি সর্গবর্ষে পঙ্গিতদের প্রতি ঘোষণা করেন, ‘হয় তর্ক বিচার করুন, না হয় জয়পত্র লিখে দিন।’ তাঁর পাণিত্যের কথা সবাই জানতেন। তাই নবদ্বীপের পঙ্গিত-সমাজ ভীত হয়ে পড়েন। তখন তরুণ পঙ্গিত নিমাই বিনয়ের সঙ্গে এগিয়ে আসেন। গজাতীরে দুজনের মধ্যে কুশল বিনিময় হয়। নিমাইয়ের অনুরোধে কেশব পঙ্গিত তৎক্ষণাত্ম মুখে মুখে শতাধিক শ্লোকে গজাতোত্ত্ব রচনা করেন। এরপর নিমাই শুনু করেন তার সমালোচনা। তিনি কোন শ্লোকে কোথায় কী ভুল আছে তা ব্যাখ্যা করেন। নিমাইয়ের সমালোচনা শুনে উপস্থিত পঙ্গিতগণ বিস্মিত হয়ে যান। কেশব মিশ্রও তাঁর ভুল স্বীকার করেন। এ ঘটনার পর নবদ্বীপে নিমাইয়ের পাণিত্যের খ্যাতি আরো বেড়ে যায়।

নিমাই একবার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে আসেন। নবদ্বীপে ফিরে গিয়ে শোনেন সর্পাঘাতে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হয়েছে। এতে তিনি খুব আঘাত পান। সংসারের প্রতি তাঁর মন উঠে যায়। ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে ধর্মানুরাগ প্রবল হয়ে ওঠে। এ বিষয়টি বুঝতে পেরে মা শচীদেবী সনাতন পঙ্গিতের কল্যাণ বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর আবার বিয়ে দেন।

কয়েক বছর সুখেই কাটে। তারপর একদিন নিমাই যান কাশীধামে। পরলোকগত পিতার আআর সদগতি কামনায় পিণ্ড দানের জন্য। সেখানে তিনি ঈশ্বরপুরীর নিকট কৃষ্ণনামে দীক্ষা নেন। এতে তাঁর মনে বিরাট পরিবর্তন আসে। নবদ্বীপে ফিরে অধ্যাপনা, সংসারধর্ম সব ছেড়ে দেন। শুধু কৃষ্ণনাম করেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণও তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ, অংগোত্তার্য প্রমুখ। এঁরা তাঁর প্রধান পার্ষদ। তবে নিত্যানন্দ ছিলেন সবচেয়ে কাছের।

অনুসারীদের নিয়ে নিমাই বাঢ়ি-বাঢ়ি গিয়ে, এমনকি গ্রামের পথে পথে কৃষ্ণনাম প্রচার করতে থাকেন। এতে অবশ্য অনেকে ক্ষুঁক হন। অনেকে বাধাও দেন। জগাই-মাধাই নামে মাতাল দুই ভাই একদিন নিমাই ও নিত্যানন্দকে আক্রমণ করেন। কিন্তু নিমাই প্রেমভক্তি দিয়ে সবাইকে আপন করে নেন। তাঁরা সকলে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে নিমাইয়ের এ প্রেমভক্তির ধর্মের প্রতি শুন্ধাশীল হন।

এদিকে সংসারের প্রতি নিমাইয়ের মন একেবারেই উঠে যায়। তিনি সংসার ত্যাগ করার কথা ভাবেন। তারপর মাঘমাসের শুক্লপক্ষের এক গতীর রাতে তিনি মা, স্ত্রী এবং ভন্তদের ছেড়ে গৃহত্যাগ করেন। কাটোয়ায় গিয়ে তিনি কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নতুন নাম হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সৎক্ষেপে শ্রীচৈতন্য।

শ্রীচৈতন্য তাঁর প্রেমভক্তির ধর্ম প্রচারের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়ান। পুরী, দাক্ষিণাত্য, বৃন্দাবন, কাশী প্রভৃতি স্থান ঘুরে তিনি জীবনের শেষ আঠার বছর পুরীর নীলাচলে অতিবাহিত করেন। এ-সময় শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট প্রমুখ বিশিষ্ট বৈষ্ণব পঙ্গিত তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

নীলাচলে অবস্থানকালে শ্রীচৈতন্য প্রায়শই কৃষ্ণনামে উন্নাদ হয়ে থাকতেন। এমনি উন্নাদ অবস্থায় ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দের আবাঢ় মাসে একদিন তিনি জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন। হঠাৎ মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সবাই বাইরে উন্মুখ হয়ে বসে থাকেন। তারপর দরজা খুলে তাকে আর দেখা যায় না। তেওঁরে শুধু জগন্নাথদেবের মূর্তি। ভক্তদের ধারণা, শ্রীচৈতন্য জগন্নাথদেবের দেহে বিশিষ্ট হয়ে গেছেন।

হিন্দুসমাজে তখন বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতা প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। শুদ্ধ ও চঙ্গালদের সবাই ঘৃণা করত। কিন্তু শ্রীচৈতন্য কোনো ভেদাভেদ মানেননি। তাঁর প্রেমভক্তির ধর্মে উচ্চ-নীচ, বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতার কোনো স্থান ছিল না। তিনি আচারালে স্নেহ বিতরণ করেছেন এবং সবাইকে বুকে স্থান দিয়েছেন। নিজে ব্রাহ্মণসভান হয়েও চঙ্গালদের সঙ্গে এক সারিতে বসে আহার গ্রহণ করেছেন। এর ফলে হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভেদ ছিল, হালাহানি ছিল, তা বহুলাখণ্টে দূর হয়েছিল। এভাবে তিনি হিন্দুসমাজকে নানা অবক্ষয় থেকে রক্ষা করেছেন। এটা তাঁর একটা বড় অবদান।

শুধু হিন্দুই নয়, তাঁর প্রেমভক্তির কাছে মুসলমান, খ্রিস্টান ইত্যাদি জাতিদেরও ছিল না। সবাইকে তিনি প্রেম দিয়ে আপন করে নিয়েছিলেন। তাই তিনি বলেছেন:

যেই ভজে, সেই বড়, অস্ত্র হীন ছাড়।
কৃকৃ ভজনে নাহি জাতি ক্লান্তি কিচার ॥
উত্তম হঞ্চা বৈকুণ্ঠ হবে নিরতিমান ।
জীবে সমান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥

শিক্ষা : শ্রীচৈতন্যের জীবনী থেকে আমরা যে নৈতিক শিক্ষা পাই, তা হলো – পাতিত্যের অহংকার করা যাবে না। সব সময় বিনয়ী থাকতে হবে। কেউ আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করলে তালো ব্যবহার দারা তাকে জয় করতে হবে। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ করা চলবে না। সবাইকে কৃষ্ণজ্ঞানে সম্মান দিতে হবে। সমাজের কাউকে ঘৃণা করা যাবে না। মানুষ হিসেবে সবাই সমান। সবাইকে সেইভাবে দেখতে হবে। তবেই সমাজের সবাই সুর্যী হতে পারবে। সমাজটাও সুন্দর হয়ে উঠবে।

একক কাজ : ক. শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ জীবন থেকে নৈতিক শিক্ষাসমূহ চিহ্নিত কর।
খ. সমাজজীবনে শ্রীচৈতন্যদেবের নৈতিক শিক্ষার প্রভাব লেখ।

দলীয় কাজ : শ্রীচৈতন্য দেবের শিক্ষা তোমাদের জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করবে ?

পাঠ ৭, ৮ ও ৯ : সাধক রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদ ছিলেন মাতৃসাধক। ব্রহ্মজ্ঞানে তিনি কাশীর সাধনা করতেন। কাশীই ছিল তাঁর নিকট দীপ্তি। হরি, ব্ৰহ্মা, শিব, দুর্গা – সবই তিনি। তাই রামপ্রসাদ বলেছেন:

কাশী ব্ৰহ্ম জ্ঞে মৰ্ম

ধৰ্মাধৰ্ম সব ভুলেছি।

১১২৭ বাঢ়া ১১২৭ সনের (১৭২০ খ্রিস্টাব্দ) আশ্বিন
মাসে রামপ্রসাদের জন্ম। পশ্চিমবঙ্গের



গজাতীরে হালিশহর গ্রামে। পিতা রামরাম সেন এবং মাতা সর্বেশ্বরী দেবী।

রামপ্রসাদ বাল্যকাল থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। অল্প বয়সেই তিনি সংস্কৃত, ফার্সি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন।

মোল বছর বয়সেই তাঁর মধ্যে অসাধারণ কবিত্বস্ত্রীর প্রকাশ ঘটে। কিন্তু সংসারের প্রতি তাঁর মন ছিল না। তাই সংসারমুখী করার জন্য তাঁকে বিয়ে করানো হলো। স্ত্রীর নাম শর্বাণী দেবী।

কিন্তু রামপ্রসাদ সংসারমুখী হলেন না। মাতৃসাধনায় তাঁর মনোযোগ আরো বেড়ে গেল। সংসারের প্রতি তিনি আরো উদাসীন হয়ে পড়লেন। এমন সময় তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। ফলে সংসারের সমস্ত দায় এসে পড়ে তাঁর ওপর। তাই অর্থোপার্জনের জন্য তিনি একদিন কোলকাতা যান।

তখন কোলকাতার গুরানহাটের জমিদার ছিলেন দুর্গাচরণ মিত্র। রামপ্রসাদ তাঁর জমিদারিতে মুহূর্রিত পদে যোগদান করেন। তাঁর কাজ হিসেব-নিকেশ রাখা। কিন্তু তাঁর মনে সবসময় মায়ের চিন্তা। তাই হিসাবের খাতায় তিনি মাতৃসঙ্গীত বা শ্যামাসঙ্গীত রচনা করে চললেন। এ খবর একদিন জমিদারের কানে গেল। তিনি খাতাসহ রামপ্রসাদকে ডাকালেন। রামপ্রসাদ তয়ে তয়ে জমিদারের কাছে গেলেন। চাকরি বুঝি আর থাকবে না। কিন্তু হলো তার বিপরীত। জমিদার রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত পড়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। তিনি বললেন, হিসাব করার জন্য তোমার জন্ম হয়নি। তোমার জন্ম হয়েছে আরো বড় কাজ করার জন্য। তুমি বাড়ি ফিরে যাও। মায়ের সাধনা করো আর শ্যামাসঙ্গীত রচনা করো। তুমি যে ত্রিশ টাকা বেতন পেতে, তা তুমি নিয়মিত পাবে।

এভাবে জমিদার দুর্গাচরণ রামপ্রসাদের মাতৃতত্ত্ব ও সঙ্গীত রচনার প্রতিভাকে সম্মান দেখালেন। রামপ্রসাদ চলে গেলেন তাঁর গ্রাম হালিশহরে। জমিদারের দেয়া টাকায় তাঁর সংসার কোনোমতে চলতে লাগল। আর একমনে তিনি মায়ের সাধনা আর শ্যামাসঙ্গীত রচনা করে চললেন।

একক কাজ : জমিদার দুর্গাচরণ রামপ্রসাদকে সম্মান দেখিয়েছিলেন কেন?

রামপ্রসাদ গজার ঘাটে বসে আপন মনে স্বরচিত শ্যামাসঙ্গীত গাইতেন। তাঁর সুমধুর গান শুনে নৌকার মাঝিদের দাঢ় থেমে যেত। একদিন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা গজার উপর দিয়ে বজরায় যাচ্ছিলেন। তিনিও বজরা থামিয়ে মন ভরে রামপ্রসাদের গান শোনেন। তাঁর মন অতিশয় তৃপ্ত হয়।

রামপ্রসাদের মাতৃসাধনা ও শ্যামাসঙ্গীতের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ও শুনতে পান এ-কথা। একদিন তিনি স্বরং চলে আসেন হালিশহরে। রামপ্রসাদকে অনুরোধ করেন রাজকবি হওয়ার জন্য। কিন্তু মাতৃসাধনা ছাড়া তিনি আর কিছুই চান না। তাই মহারাজার প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। মহারাজা রামপ্রসাদের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কিছু নিষ্কর্ষ জমি দান করেন। আর তাঁকে অনুরোধ করেন ‘বিদ্যাসুন্দর’ নামে একটি কাব্য রচনা করতে। ভক্তকবি রামপ্রসাদ শ্যামা মায়ের অনুগ্রহে যথাসময়ে উক্ত কাব্য রচনা করে তুলে দেন মহারাজার হাতে। মহারাজা তাঁর সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরকে কাব্যটি পড়তে দেন। ভারতচন্দ্র কাব্যটি পড়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী মহারাজা রামপ্রসাদকে ‘কবিরঞ্জন’ উপাধিতে ভূষিত করেন।

শ্যামা মা ছিলেন রামপ্রসাদের ধ্যান-জ্ঞান। আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে তিনি শুধু মায়ের কথাই চিন্তা করতেন। অন্য কোনো কিছুর প্রতিই তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি হাতে কাজ করতেন, মুখে শ্যামা মায়ের নাম

শুরু করেন। আর অবসর পেলেই বটগাছের নিচে গিয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতেন। এর ফলে তাঁর পড়াশোনা বেশি দূর এগোয় নি। পাবনা শহর ও শহরতলিতে তাঁর এক তরুণ ভক্তদল গড়ে উঠে। জগদ্বন্ধুর প্রকৃত নাম ছিল জগৎ। কিন্তু তাঁর ভক্তরা তাঁকে ডাকতেন ‘প্রভু জগদ্বন্ধু’ বলে। পরবর্তীকালে তিনি এই নামেই পরিচিত হয়ে উঠেন।

জগদ্বন্ধু একদিন ভক্তদের ছেড়ে তীর্থ ভ্রমণে বের হন। তিনি বিভিন্ন তীর্থ ও গ্রাম-গঞ্জে হরিনাম বিলিয়ে উপস্থিত হন শ্রীধাম বৃন্দাবনে। সেখানে তাঁর সাধনা চলতে থাকে গভীর থেকে গভীরে। তিনি শ্রীরাধার ভক্ত হয়ে যান। রাধার নাম শুনলেই তিনি ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন।

বৃন্দাবনে কিছুকাল থেকে জগদ্বন্ধু ফিরে আসেন ফরিদপুরে। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মণকল্পায় আসন পাতেন। তখন ফরিদপুরের উপকঠে ছিল সাঁওতাল, বাগদী ও নমঘন্টদের বাস। সমাজপতিদের দৃষ্টিতে তারা ছিল ঘৃণ্ণ্য ও অস্মৃশ্য। এদের জন্য জগদ্বন্ধুর মন কেঁদে উঠল। তিনি একদিন বাগদীদের সর্দার রজনীকে ডেকে পাঠালেন। রজনী এলে প্রভু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রভুর আলিঙ্গনে রজনী ধন্য হলেন। রজনী বললেন, ‘আমরা নীচু জাতি। সবাই আমাদের ঘৃণা করে আর তুমি আমাকে বুকে টেনে নিলে!’ প্রভু তখন বললেন, ‘কে বলেছে তোমরা নীচু জাতি? মানুষের মধ্যে কোনো উচু-নীচু নেই। সবাই সমান। সবাই দ্বিতীয়ের সত্তান। তোমরা সবাই শ্রীহরির দাস। তোমাদের পাড়ার সকলে মোহাস্ত বৎশ। আজ থেকে তোমার নাম হরিদাস মোহাস্ত। ভুবন মঞ্জল হরিনাম কর। সকলে ধন্য হও। অচিরেই তোমাদের সকল দুঃখ ঘুচে যাবে।’

প্রভুর কথা আর ব্যবহারে রজনী অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি বাড়ি ফিরে সবাইকে এ-কথা বললেন। সবাই মিলে হরিনামে মেতে উঠলেন। হরিদাস মোহাস্ত অঞ্জদিনের মধ্যেই প্রভুর কৃপায় প্রসিদ্ধ পদকীর্তনীয়া রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। ধীরে ধীরে ফরিদপুর, বরিশাল, যশোর প্রভৃতি জেলায় হরিনাম কীর্তনের এক অভূত সাড়া পড়ে গেল। প্রভুর হরিনাম কীর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে মহানাম সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায় গঠনে থার অবদান বেশি, তিনি হলেন প্রভুর অনুরক্ত ভক্ত শ্রীগান্ধীজী।

পশ্চিমবঙ্গেও প্রভুর নামের মাহাত্ম্য পরিব্যাপ্ত হলো। সেখানকার নীচু জাতি হিসেবে গণ্য ডোমেরা প্রভুর প্রেরণায় উজ্জীবিত হলো। কোলকাতার ডোমপল্লির বাসিন্দাদের মধ্যে সংকীর্তনের দল গড়ে উঠল। তারা হয়ে উঠল ব্রজজন। মানুষের অধিকার নিয়ে মানুষরূপে মাথা উচু করে সমাজে চলার সাহস পেল তারা। সমাজ পরিবর্তনে প্রভু জগদ্বন্ধুর এই অবদান চিরস্মরণীয়।

একক কাজ : সমাজ পরিবর্তনে প্রভু জগদ্বন্ধুর ভূমিকা উল্লেখ কর।

প্রভু একদিন ভক্তদের নিয়ে ভ্রমণে বের হয়েছেন। ফরিদপুর শহরের অন্তিমদূরে এক জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় এসে তিনি বললেন, ‘এখানেই আমি শ্রীঅঞ্জন প্রতিষ্ঠা করব।’ এরপর তাঁর অনুপ্রেরণায় ঐ স্থানেই শ্রীঅঞ্জন প্রতিষ্ঠিত হলো। এই শ্রীঅঞ্জনেই শুরু হয় প্রভুর গম্ভীরা লীলা। ১৩০৯ সালের (১৯০২ খ্রিষ্টাব্দ) আষাঢ় থেকে আরম্ভ করে ১৩২৫ সালের (১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ) ১৬ ফাল্গুন পর্যন্ত ১৬ বছর ৮ মাস প্রভুর গম্ভীরা লীলা চলে। এ সময় তিনি ছিলেন মৌনী। এর তিন বছর পরে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে প্রভু ইহলীলা সংবরণ করেন।

প্রভু জগদ্বন্ধু ‘শ্রীশ্রীহরিকথা’, ‘চন্দ্রপাত’ ও ‘ত্রিকাল’ নামে তিনখানা গ্রন্থ এবং বহু কীর্তন রচনা করে গেছেন।

ধর্মচার্য যাতে কোনো বিষ্ণু না ঘটে, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

বিবেকানন্দ কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। কাজ ছাড়া তিনি কিছুই বুঝতেন না। তাই বিশ্বামের অভাবে অবস্থানেই তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। ফলে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই বেলুড় মঠে তিনি দেহত্যাগ করেন।

শিক্ষা : বিবেকানন্দের জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, সততা ও নিতীকতা মানুষের দুটি শ্রেষ্ঠ গুণ। এছাড়া কেউ বড় হতে পারে না। পৃথিবীর সকল মানুষ এক জাতি। ধর্ম তাদের পৃথক পৃথক হতে পারে। তবে সব ধর্মেরই ভিত্তি এক এবং তা হলো সত্য। সত্যই ধর্ম। পরোপকার, স্বাধীনতা – এগুলো ধর্মের অঙ্গ। পরাধীনতা ও পরাধীড়ন পাপ। মানুষকে ধর্মের কথা বলার আগে তার দায়িত্ব মোচন করতে হবে। কারণ খালি পেটে কেউ ধর্মের কথা শুনতে চায় না। ধনী-দরিদ্র, যুটি-মেধরে কোনো পার্থক্য নেই। সবাই ভাই-ভাই। কোনো মানুষই অস্পৃশ্য নয়, পেশা তার যা-ই হোক। আজ্ঞাবিদ্যাস ও ইশ্বরে বিশ্বাস উন্নতির প্রথম শর্ত। ধর্মচার্য আগে শরীর সূস্থ ও বলবান রাখতে হবে। কারণ দুর্বল শরীরে শুধু ধর্ম নয়, কোনো কাজই ঠিকমতো করা যায় না।

বিবেকানন্দের এই শিক্ষা আমরা আমাদের জীবনে কাজে লাগাব। তাহলে আমরাও সফল জীবনের অধিকারী হতে পারব।

দলীয় কাজ : স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শের শিক্ষাসমূহ চিহ্নিত কর।

পাঠ ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ : প্রভু জগদ্বন্ধু

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ডাহাপাড়া থামে জন্মাই হণ করেন প্রভু জগদ্বন্ধু। তাঁর পিতা দীননাথ চক্রবর্তী, মাতা বামাদেবী। বাবা-মার তৃতীয় সন্তান ছিলেন জগদ্বন্ধু। দীননাথের পিতৃনিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার কোমরপুর থামে। পুরো তাঙ্গানে গ্রামটি বিলীন হয়ে গেলে তাঁরা গোবিন্দপুর থামে এসে বসবাস করেন। দীননাথ ছিলেন একজন শান্তজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি ‘ন্যায়রত্ন’ উপাধি পেয়েছিলেন। কর্মোপলক্ষে তিনি মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলেন। সেখানে অতি অল্প বয়সে তাঁর শ্রীর মৃত্যু হয়। জগদ্বন্ধুর তখন শৈশব অবস্থা। শ্রীর মৃত্যুর পর দীননাথ চলে আসেন স্বর্গাম গোবিন্দপুরে। তখন জগদ্বন্ধুর লালন-পালনের তার পড়ে তাঁর জেতুত বোন দিগন্ধরীর ওপর।

জগদ্বন্ধুর বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। এর কয়েক মাস পর গোবিন্দপুর গ্রামটিও পদ্মার তাঙ্গানে পড়ে। তখন চক্রবর্তী পরিবার চলে আসে ফরিদপুরের শহরতলি ব্রাহ্মণকল্পদায়।

জগদ্বন্ধু ফরিদপুর জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি পাবনা শহরে গিয়ে পড়াশোনা করেন। শহরের উপকঠে ছিল এক প্রাচীন বটগাছ। তার নিচে ধাকতেন এক বাকসিন্ধ মহাপুরুষ। মানুষ তাঁকে ‘ক্ষ্যাপা বাবা’ বলে ডাকত। একদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় জগদ্বন্ধু। জগদ্বন্ধু তাঁকে বলতেন ‘বুড়ো শিব’। সময় পেলেই জগদ্বন্ধু তাঁর কাছে যেতেন। এর ফলে দুজনের মধ্যে তাব হয়ে যায়। জগদ্বন্ধুর তেতরে একটা পরিবর্তন আসে। তিনি গৌরাঙ্গ তাঁবে ভাবিত হয়ে ভক্তিধর্মের গদ রচনা করতে



ইউরোপের মানুষ হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে নতুন করে জানতে পারেন। অনেকে তাঁর পরম ভজ্ঞ হয়ে যান। তাঁদের মধ্যে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিবেকানন্দের আদর্শে এতটাই উদ্বৃদ্ধ হন যে, নিজের জন্মভূমি আয়ারল্যান্ড ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। বিবেকানন্দের কাছে তিনি দীক্ষা নেন। তখন তাঁর নাম হয় ভগিনী নিবেদিতা।

প্রায় চার বছর পৃথিবী ভ্রমণ করে বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে দেশে ফেরেন। দেশের মানুষ তাঁকে মহাসমাদরে গ্রহণ করে। বিশাল সংবর্ধনা দেয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি দেশের মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে বলেন। সমস্ত কুসংস্কার পরিত্যাগ করতে বলেন। দেশের সব মানুষকে বিভেদ ভুলে এক হতে বলেন। তিনি বলেন, শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম। দুর্বলতা ও কাপুরাঙ্গতাই পাপ। স্বাধীতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ।

একক কাজ : শিকাগো বিশ্বধর্মসভায় স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ বক্তা হওয়ার কারণগুলো নির্ণয় কর।

বিবেকানন্দ বলতেন, সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি। পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। সৎ হওয়া আর সৎ কর্ম করা ধর্মের অঙ্গ। নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মৃচি, মেঘের সকলেই আমাদের ভাই। এদের সেবাই পরম ধর্ম। আত্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরে বিশ্বাস – এ-দুটি জিনিসই উন্নতি লাভের একমাত্র উপায়। যুবকদের আগে শরীর গঠন করতে হবে। তারপর ধর্ম চর্চা করবে। দুর্বল শরীরে ধর্মচর্চা হয় না। কোনো কাজই হয় না। এজন্য তাদের গীতা পড়ার আগে ফটুকুল খেলতে হবে। তাতে শরীর গঠিত হবে। তখন তারা গীতা আরো ভালো বুঝবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো – খালি পেটে ধর্ম হয় না। তাই সবার আগে মানুষের দারিদ্র্য ঘোচাতে হবে। ঈশ্বরজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে। জীবসেবা করলেই ঈশ্বরসেবা হবে। এ ব্যাপারে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি অরণ করা যেতে পারে:

**বহুবূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা ঝুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥**

বিবেকানন্দের কাছে উচ্চ-নীচু কোনো তেজাতেন্দে ছিল না। অসৃশ্যতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। বিবেকানন্দ তাঁর গুরুদেব রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নামে একটি মঠ স্থাপন করেন। রামকৃষ্ণ মঠ। পঞ্চমবঙ্গের হাওড়া জেলার বেলুড়ে গঞ্জার পশ্চিম পাড়ে এটি অবস্থিত। সাধারণভাবে এটি বেলুড় মঠ নামে পরিচিত। মানবসেবার আদর্শ নিয়ে এ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গুরুদেবের আদর্শ প্রচারের জন্য বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনও প্রতিষ্ঠা করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা রয়েছে। এসবের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ। বাহ্লাদেশে যেসব মঠ ও মিশন রয়েছে, সেসবের প্রধান কেন্দ্র ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন। পৃথিবীব্যাপী এই মঠ ও মিশনের মাধ্যমে শত শত মানুষকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, চিকিৎসা, আপত্কালীন সাহায্য প্রদান ইত্যাদি।

বিবেকানন্দের সেবাধর্মে কোনো জাতিতে বা ধর্মতে বাঁচি না। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সেবা প্রদান করতেন। একবার কোলকাতায় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তখন রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। সেখানে কয়েকজন মুসলমান বালক এসেছিল থাকার জন্য। এদের কী করা হবে জানতে চাইলে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, মুসলমান বালকেরা অবশ্যই থাকবে। শুধু তা-ই নয়, তাদের খাওয়া-দাওয়া এবং

তাঁর মনে এক পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি কেবল ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করেন। ঈশ্বর কি আছেন? তাঁকে কি দেখা যায়? এ ধরনের প্রশ্ন অহরহই তাঁর মনে জাগে। তিনি অনেককে এ প্রশ্ন জিজ্ঞেসও করেছেন। কিন্তু সদৃশুর মেলেনি। এমন সময় একদিন তাঁর দেখা হয় সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। রামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে থাকেন। নরেন্দ্রনাথ একদিন চলে যান সেখানে। রামকৃষ্ণকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, ‘আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?’ রামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বলেন, ‘হ্যাঁ, দেখেছি; যেমন তোকে দেখেছি। চাইলে তোকেও দেখাতে পারি।’

এই সাদাসিধে সাধক শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রনাথের ভালো লাগে। তাঁর প্রতি কেমন যেন একটা ভক্তির ভাব জেগে ওঠে। তাই তিনি নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন। এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নেন। নরেন্দ্রনাথ হন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। তখন তাঁর নাম হয় বিবেকানন্দ। পরবর্তীকালে ভক্তরা তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ বা শুধু স্বামীজী বলেই ডাকতেন।

বিবেকানন্দ গৃহত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ এবং তার মানুষকে ত্যাগ করেননি। তাই তিনি বেরিয়ে পড়লেন দেশের পথে পথে। নিজের চোখে দেখতে চাইলেন ভারতবর্ষের মানুষের অবস্থা। তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘূরলেন। দেখলেন, সারা দেশে কেবল দারিদ্র্য আর দারিদ্র্য। কেবল অশিক্ষা আর কুশিক্ষা। দেশবাসীর এই হীন অবস্থা দেখে তিনি খুব কষ্ট পেলেন। তিনি এই অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর দারিদ্র্যের কারণ জানতে চাইলেন। কীভাবে এসব থেকে দেশবাসীকে উন্ধার করা যায়, সে-কথাও চিন্তা করতে লাগলেন।

দেশে তখন ইংরেজ শাসন চলছে। পরাধীন দেশ। তিনি বুঝতে পারলেন, পরের শাসনে দেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এ দেশকে বাঁচাতে হবে, জাগাতে হবে। দেশকে স্বাধীন করতে হবে। পরাধীন দেশ কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না। দেশের দারিদ্র্য দূর করতে হবে। অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর করতে হবে। সব মানুষকে ভালোবাসতে হবে। সবার মধ্যে আত্মিক জাগিয়ে তুলতে হবে। তবেই দেশের উন্নতি হবে।

দলীয় কাজ : দেশের উন্নতির জন্য স্বামীজী কী কী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছেন।

১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বিবেকানন্দ আমেরিকা যান। সেখানে শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে তিনি বক্তৃ দেন। বক্তৃতার শুরুতে তিনি উপস্থিত সকলকে ‘ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ’ বলে সম্বোধন করেন। অন্যরা করেছেন প্রথাগতভাবে ‘ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ’ বলে। কিন্তু বিবেকানন্দের মুখে এই নতুন সম্বোধন শুনে উপস্থিত সকলে মুখ হন। অজানা অচেনা লোকদের ভাবাবে ভাই-বোন বলে আপন করে নেয়ার মানসিকতা দেখে তাঁরা বিস্মিত হন। তারপর বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ‘হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সকল ধর্মকে সমান সত্য মনে করে। সব ধর্মের লক্ষ্যই এক। নদীসমূহ যেমন এক সাগরে গিয়ে মিলিত হয়, তেমনি সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক – ঈশ্বরলাভ। তাই বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরম্পরার ভাব গ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।’ বিবেকানন্দের এই বক্তৃতায় সবাই অত্যন্ত খুশি হন। ধর্মসভার বিচারে তিনি হন শ্রেষ্ঠ বক্তা। তখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ বছর আট মাস।

ধর্মসভায় বক্তৃতার পর সারা আমেরিকায় বিবেকানন্দের নাম ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আহ্বান আসে বক্তৃতার জন্য। তিনিও হিন্দু ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে একের পর এক বক্তৃ দিয়ে আমেরিকা জয় করেন। তারপর যান ইউরোপ। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশ ঘূরে বেড়ান এবং বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তৃতা থেকে

পাঠ ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ : স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি কোলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন একজন নামবরা উকিল। তিনি একজন পশ্চিতও ছিলেন। অনেক তার্যা জানতেন। বিবেকানন্দের মা ভূবনেশ্বরী দেবী ছিলেন একজন সুগৃহিণী।

বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ছেলেবেলায় তাঁর আরেকটি নাম ছিল – বীরেশ্বর। তবে আদর করে তাঁকে সবাই ‘বিলে’ বলে ডাকতেন।

বিবেকানন্দের জীবন খুব দীর্ঘ ছিল না। মাত্র ৩৯ বছর ৫ মাস ২৩ দিন তিনি বৈঁচেছিলেন। এই অল্প সময়ে ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের মানব জাতির কল্যাণের জন্য তিনি যে অবদান রেখে গেছেন, তা অসাধারণ। চিরদিন মানুষ তাঁর এই অবদানের কথা মরণ করবে।

আগেই বলা হয়েছে, ছেলেবেলায় বিবেকানন্দকে সবাই বিলে বলে ডাকতেন। বিলে ছিলেন খুবই দুর্স্ত ও একরোধা। তবে খুব মেধাবী। শেখাপড়ায় খুব ভালো ফল করতেন। পাশাপাশি খেলাখুলা ও গানবাজনায়ও পারদর্শী ছিলেন।

বিলের মধ্যে ছেলেবেলায়ই আরো অনেক গুণের প্রকাশ ঘটেছিল। তিনি যেমন ছিলেন সত্যবাদী, তেমনি ছিলেন নিষ্ঠীক। একটি ঘটনা থেকে তা জানা যায়। একদিন শ্রেণিতে শিক্ষক পড়াচ্ছেন। বিলে তখন কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। তা দেখে শিক্ষক রেগে যান। তিনি তাঁদের পড়া জিজ্ঞেস করেন। বিলে ছাড়া আর কেউ পড়া বলতে পারেননি। কারণ বিলে পড়াও শুনছিলেন আর কথাও বলছিলেন। তাই শিক্ষক বিলে বাদে অন্যদের দাঁড়াতে বললেন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে বিলেও উঠে দাঁড়ালেন। শিক্ষক বললেন, ‘তোমাকে দাঁড়াতে হবে না।’ উত্তরে বিলে বললেন, ‘আমিও তো কথা বলেছি। অপরাধ তো আমিও করেছি।’ বিলের এই সততা ও নিষ্ঠীকতায় শিক্ষক খুব খুশ হন। বিলের এই সততা ও নিষ্ঠীকতা তাঁর পরবর্তী জীবনেও আমরা দেখতে পাই।

বিলে সাধু-সন্ন্যাসীদের খুব শ্রদ্ধা করতেন। দরিদ্রদেরও খুব ভালোবাসতেন। তাই তাঁদের দেখলে দৌড়ে ঘরে যেতেন। ঘরে জামা-কাপড়, খাবার-দাবার যা পেতেন, এনে দিয়ে দিতেন।

একক কাজ : বিলে কীভাবে সততা ও নিষ্ঠীকতার পরিচয় দিয়েছিল ?

বিলে যে পরবর্তী জীবনে বীর সন্ন্যাসী হবেন, স্বামী বিবেকানন্দ হবেন, তাঁর আভাস তাঁর ছেলেবেলায়ই পাওয়া গেছে। বিলে ছিলেন তাঁর খেলার সাথীদের দলনেতা। সুযোগ পেলেই তিনি সাথীদের নিয়ে ‘ধ্যান-ধ্যান’ খেলায় মেঠে উঠতেন। কখনো একা-একাই ধ্যানমঞ্চ হয়ে যেতেন। ধ্যান করাটা তাঁর একটা প্রিয় খেলা ছিল।

বিলে বড় হয়েছেন। স্কুল-কলেজের পঞ্জীক্ষায় ভালো ফল করেছেন। এখন তাঁকে সবাই আসল নামেই ডাকে। নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথ বিএ-ও পাশ করেছেন। আইন ও দর্শন বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান। এ-সময়ে



১২৯৩ সালের ৩১ শ্রাবণ (১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট) শ্রীরামকৃষ্ণ পরলোক গমন করেন। জীবনসাথীকে হারিয়ে শ্রীমা যেন একেবারে একা হয়ে যান, যদিও তাঁর ভক্ত-সন্তানেরা সব সময় তাঁকে ঘিরে থাকতেন। মনের শান্তির জন্য কিছুদিন পরে শ্রীমা তীর্থভ্রমণ শুরু করেন। এ উপলক্ষে তিনি কাশী, কৃদাবল, পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ করে আসেন। এতে তাঁর মন অনেকটা শান্ত হয়।

সারদা দেবী শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মনটা ছিল খুব উদার। তাঁর মধ্যে কোনো কুসংস্কার ছিল না। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ভগ্নী নিবেদিতার একটি ঘটনায়। বিবেকানন্দ একদিন নিবেদিতাকে পাঠিয়েছেন সারদা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তিনি গেছেন। তার আগে একজন শিষ্য গিয়ে সারদা দেবীকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি এই মেমসাহেবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন কি-না। উত্তরে সারদা দেবী বললেন, ‘নরেন একটি শ্঵েতপদ্ম পাঠিয়েছে। তা কি আমি না নিয়ে পারি?’ সেকালে কতটা উদার হলে একজন বিদেশিনীকে এভাবে আপন করে নেয়া যায়?

শেষ বয়সে শ্রীমা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। শিষ্য সারদানন্দকে ডেকে বলেন, ‘আমার বোধ হয় যাবার সময় হলো।’ এর কিছুদিন পর ১৩২৭ সালের (১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ) ৪ শ্রাবণ মা সারদা নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। বেলুড় মঠে তাঁর দেহের সৎকার করা হয়। পরের বছর সেখানে একটি মাতৃমন্দির নির্মিত হয়।

সারদা দেবীর কয়েকটি উপদেশ

১. পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই। পৃথিবীর ওপর কত রকমের অত্যাচার হচ্ছে, পৃথিবী অবাধে সব সইছে, মানুষেরও সেই রকম চাই।
২. যদি শান্তি চাও, কারণ দোষ দেখ না, দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ, কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।
৩. সাধন বল, ভজন বল প্রথম বয়সেই করে নেবে। শেষে কি আর হয়? যা করতে পার এখন কর।

শিক্ষা: সারদা দেবীর জীবনী থেকে আমরা প্রথমেই যে নৈতিক শিক্ষাটি পাই, তা হলো ত্যাগ। ত্যাগ না করলে বড় কিছু হওয়া যায় না। সারদা দেবীর ত্যাগের কারণেই গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণ হতে পেরেছিলেন। যারা শুধু সংসারে আবন্ধ থাকে, তারা জগতের জন্য কিছু করতে পারে না। মানুষের মধ্যে সহ্যগুণ থাকতে হবে। মানুষ অসহিষ্ণু হলে সমাজে শান্তি আসবে না। কেবল অন্যের দোষ না দেখে নিজের দোষ দেখতে হবে। তবেই জগৎকে ভালোবাসা যাবে। জগতের সকলকে আপন করা যাবে। সাধন-ভজন প্রথম বয়সেই করতে হবে, কেননা শরীর তখন সুস্থ-স্বল থাকে। দুর্বল শরীরে কোনো কাজই হয় না।

সারদা দেবীর এই শিক্ষা আমরা সবসময় মনে রাখব এবং তা পালন করব।

দলীয় কাজ : মা সারদাদেবীর জীবনের ঘটনাপ্রবাহ ও শিক্ষা চিহ্নিত কর।

সারদা দেবীদের পরিবার সচ্ছল ছিল না। সামান্য জমি-জমার ফসল এবং পিতা পৌরোহিত্য করে যা অর্জন করতেন, তা দিয়ে কোনোরকমে সৎসার চলত।

সেকালে সাধারণ লোকের ধারণা ছিল, মেয়েরা লেখাপড়া করলে আর সৎসারের কাজ করবে না। তাই পিতা রামচন্দ্র সারদা দেবীর লেখাপড়ার প্রতি ছিলেন উদাসীন। কিন্তু সারদা দেবী নিজের উৎসাহে ভাইদের সঙ্গে গ্রামের পাঠশালায় যেতেন। এভাবে তিনি কিছু কিছু পড়তে শিখেছিলেন, কিন্তু লিখতে শেখেননি। তবে কথক ঠাকুরদের কথা, যাত্রা, কীর্তন প্রভৃতি শুনে শুনে তিনি নানা বিষয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

একক কাজ : সারদা দেবীর বাল্যজীবন সম্পর্কে লেখ।

কামারপুকুর গ্রামের শ্বুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র গদাধরের সঙ্গে সারদা দেবীর বিয়ে হয়। এই গদাধরই বিখ্যাত সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

সারদা দেবী স্বামীর সান্নিধ্য খুব একটা পাননি। তাঁদের দাস্ত্যজীবনও দীর্ঘ ছিল না। বিয়ের বছর দেড়েক পরে শ্রীরামকৃষ্ণ চলে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। সারদা দেবী চলে যান পিত্রালয়ে। দুই বছর পর জয়রামবাটীতে তাঁদের আবার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে কিছুদিন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার দক্ষিণেশ্বরে চলে আসেন। দীর্ঘ সাত বছর পর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মভূমি কামারপুকুর দর্শনে যান। সেখানে সারদা দেবীর সঙ্গে তাঁর পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। এ সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা দেবীকে জীবনের কর্তব্য ও ঈশ্বর সম্পর্কে অনেক উপদেশ দেন। তিনি বলেন, ‘ঈশ্বর সকলেরই অতি আপনার। যে তাঁকে মনে-প্রাণে ভালোবাসে, ডাকে, সে-ই তাঁর দেখা পায়। তুমি যদি ডাক, তুমিও তাঁর দেখা পাবে। তাঁর দেখা পাওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য।’ স্বামীর এই উপদেশ সারদা দেবীর অন্তর স্পর্শ করে। তিনি একে মন্ত্রবৃগ্রে গ্রহণ করে সাধনার পথে যাত্রা শুরু করেন। অন্য স্ত্রীলোকদের মতো তিনি নিজেকে সৎসার-বৰ্ণনে আবন্ধ করেননি। স্বামীকেও ছেড়ে দিয়েছেন সাধনার জগতে।

সাত মাস পরে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার দক্ষিণেশ্বরে চলে আসেন। সারদা দেবী চলে যান পিত্রালয়ে।

তারপর দীর্ঘদিন কেটে যায়। স্বামীর চিন্তায় সারদা দেবী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন দক্ষিণেশ্বরে যাবেন। পিতাকে তাঁর মনোভাব জানান। রামচন্দ্র মেয়েকে নিয়ে রওনা হন। সেটা ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় কোলকাতার গঙ্গাতীরে গঙ্গামান উৎসব হবে। এই উৎসবকে সামনে রেখেই তাঁরা যাত্রা করেন। অনেক কষ্ট করে পায়ে হেঁটে তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে পৌছান।

দক্ষিণেশ্বরে এসে সারদা দেবী স্বামীর সেবা-যত্নে মন-প্রাণ ঢেলে দেন। স্বামীর সাধনায় যাতে কোনোরকম বিষ্ণু না ঘটে, সে ব্যাপারে তিনি ছিলেন সতত যত্নশীল। তিনি নিজেও স্বামীর উপদেশমতো কঠোর সাধনায় মগ্ন হন। এর ফলে সকলের কাছে তাঁর নতুন পরিচয় হয় ‘শ্রীমা’ বলে।

দলীয় কাজ : সারদা দেবীর ‘শ্রীমা’ হয়ে ওঠার কারণগুলো উল্লেখ কর।

সারদা দেবীও তাঁর আচার-আচরণ ও সাধন-ভজনের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে ওঠেন। সকলেই তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি করত। তিনিও সকলকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করতেন। এভাবে স্বামী-স্ত্রী মিলে ঈশ্বর সাধনায় আত্মানিয়োগ করেন।

নিতেন। এই একনিষ্ঠতার কারণে শ্যামা মা-ও তাঁর একান্ত আপনজন হয়ে গিয়েছিলেন। কল্পারূপে তিনি রামপ্রসাদের নিকট ধরা দিয়েছিলেন। ঘটনাটি এরূপ :

একদিন রামপ্রসাদ ঘরের বেড়া বাঁধিলেন। অপর পাশ থেকে মেয়ে জগদীশ্বরী তাঁকে সাহায্য করছিল। এক সময় বয়সের চাপল্যবশত জগদীশ্বরী খেলতে চলে যায়। তখন মা শ্যামা মেয়ের রূপ ধরে এসে রামপ্রসাদকে কাজে সাহায্য করেন। অনেকক্ষণ পরে জগদীশ্বরী এসে দেখে বাবার বেড়া বাঁধা হয়ে গেছে। সে বাবাকে সব খুলে বলল। তখন রামপ্রসাদ বুঝতে পারলেন শ্যামা মা-ই তাঁর মেয়ের রূপ ধরে এসেছিলেন। রামপ্রসাদ মা-মা বলে ডাকতে লাগলেন। ভক্তিভাবে তাঁর দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

রামপ্রসাদের সাধনা চলতে লাগল। গভীর থেকে গভীরে। রাতদিন তিনি শুধু মায়ের চিন্তায়ই মগ্ন থাকেন। তাঁর এই একনিষ্ঠ সাধনায় একদিন মা এসে দেখা দিলেন। চারদিক আলোকিত করে তিনি রামপ্রসাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। রামপ্রসাদ মায়ের চরণে পূর্ণাঙ্গলি অর্পণ করলেন। তাঁর সাধনা সিদ্ধ হলো। মাতৃরূপে ঈশ্বর সাধনার যে দৃষ্টিতে রামপ্রসাদ স্বাপন করলেন, তা-ই পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ, বামক্ষেপা প্রমুখ সাধককে এ সাধনায় উদ্বৃন্দ করে।

রামপ্রসাদ মাতৃসাধনা করতে গিয়ে যে-সব শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন, তা বাংলা সঙ্গীতজগতে এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর গানগুলো ‘রামপ্রসাদী’ গান নামে পরিচিত। এর মধ্য দিয়ে যেমন ঈশ্বরসাধনা হয়, তেমনি জননাত্মী মায়ের প্রতিও শৃদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। পৃথিবীতে মা হচ্ছেন সন্তানের কাছে সবচেয়ে আপন। এই চিন্তা থেকেই হয়তো রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে মাতৃজ্ঞানে আরাধনা করেছেন। ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে এই মাতৃসাধক ইহলোক ত্যাগ করেন।

শিক্ষা : রামপ্রসাদের জীবনী থেকে আমরা প্রথমেই যে নৈতিক শিক্ষাটি পাই তা হলো, একনিষ্ঠতা। একনিষ্ঠ থাকলে যে-কোনো কাজে সফল হওয়া যায়। দ্বিতীয়ত ঈশ্বরকে মাতৃরূপে সাধনা করলে জননাত্মী মায়ের প্রতিও শৃদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। তাই একনিষ্ঠতা শুধু ধর্মচর্চার ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সব কাজেই থাকতে হবে। জাগতিক বিষয়ের প্রতি নির্ণোত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আমাদের সব কাজ করতে হবে।

দশীয় কাজ : সাধক রামপ্রসাদের জীবনের ঘটনাবলি এবং এর শিক্ষা চিহ্নিত কর।

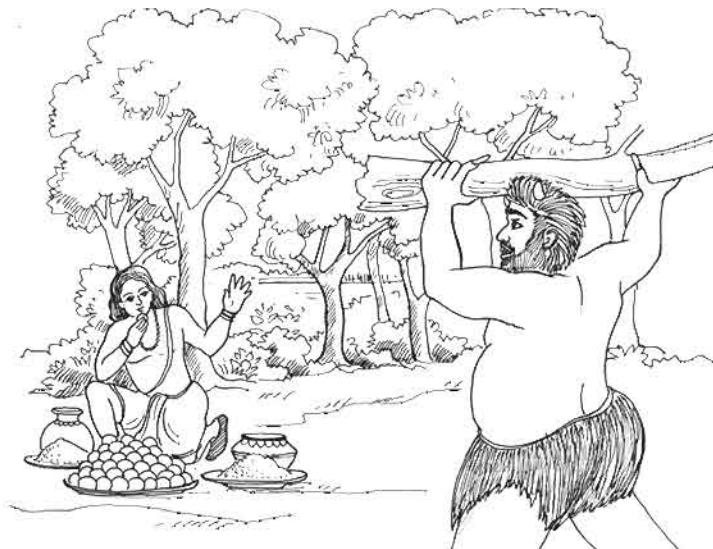
পাঠ ১০, ১১ ও ১২ : সারদা দেবী

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে সারদা দেবীর জন্ম। সে দিনটি ছিল বাংলা ১২৬০ সালের (১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দ) ১৮ পৌষ বৃহস্পতিবার। পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাতা শ্যামাসুন্দরী। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় ঠাকুরমণি দেবী। মা নাম রাখেন ক্ষেমাঞ্জলী। প্রেহময়ী মাসি নাম রাখেন সারদা। মাসির রাখা নামেই পরবর্তীকালে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। সারদা দেবী ছিলেন তাঁর মা-বাবার প্রথম সন্তান। তাঁর আরো একটি বোন ও গাঁচটি ভাই ছিল।



জীবের দৃঃখ-কষ্ট দূর হয়। পরোপকারী এবং উপকৃত ব্যক্তির মধ্যে স্থাপিত হয় প্রীতির বস্থন। তাই ব্যক্তিজীবন ও সমাজের ক্ষেত্রে পরোপকার বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

মহাভারতে আছে—একদা একটি রাক্ষস এক থামে এসে খুব অত্যাচার শুরু করল। রাক্ষসটার নাম ‘বকরাক্ষস’।



সে প্রতিদিন অনেক মানুষ ও গৃহপালিত পশু আক্রমণ করে মেরে ফেলত। তারপর কিছু খেত, কিছু পড়ে ধাকত। হামের মানুষের তখন বকরাক্ষসকে অনুরোধ জানাল, ‘প্রতিদিন প্রতি বাড়ি থেকে একজন করে মানুষ দেব। এভাবে এত গোক, এত পশু মেরে ফেল না। বকরাক্ষস তাতে রাজি হলো।

একদিন এক পরিবারের গালা এলো। ঐ পরিবার থেকে একজনকে রাক্ষসের খাদ্য হয়ে মরতে হবে।

তখন মা কৃত্তীসহ পাড়বেরা পাঁচতাই—যুথিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—ঐ বাড়িতে ছিলেন। কান্নাকাটি শুনে এগিয়ে গেলেন কৃত্তী।

ঐ পরিবার থেকে বকরাক্ষসের খাদ্য হিসেবে যার বাওয়ার কথা ছিল, মা কৃত্তীর অনুরোধে পুত্র ভীম তাকে রক্ষা করলেন। বকরাক্ষসকেও মেরে ফেললেন। গ্রামবাসীরাও বিপদ থেকে মুক্ত হলো। ভীমের এ আচরণ পরোপকারের দৃষ্টান্ত।

আমরাও পরোপকারী হবো। তাহলে আমাদের চরিত্র উন্নত হবে। সমাজের অন্যান্য মানুষও উপকৃত হবে।

দলীয় কাজ : পরিপোকারের পাঁচটি দৃষ্টান্ত চিহ্নিত করে এর প্রভাব লেখ।

পাঠ ৪ : সেবা

সেবা শব্দটির অর্থ হচ্ছে যত্ন বা শুশৃষা। সেবার আর একটি অর্থ পরিচর্যা। পরম মমতায় অপরের পরিচর্যা করাকে সেবা বলে। এটি মানুষের একটি বিশেষ গুণ। সেবা পরম ধর্ম। শাস্ত্রে বলা হয়েছে শিবজ্ঞানে

ଏই ସେ, ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ଭେଦାଭେଦହିନ୍ଦ ଚେତନା ଏକେଇ ବଲେ ଉଦାରତା । ସୁତରାଂ ଉଦାରତା ଏକଟି ନୈତିକ ଗୁଣ ଏବଂ ଧର୍ମର ଅଞ୍ଜଳି । ଉଦାରତା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ରକେ ଉନ୍ନତ କରେ । ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି କଥନଓ ଏଟା ପେଲାମ ନା, ଓଟା ପେଲାମ ନା ବଲେ ହା-ହୁତାଶ କରେନ ନା । ତିନି ନିଜେକେ କଥନଓ ବସିଥିବ ବୋଧ କରେନ ନା । ପାଓଯାତେ ନୟ, ଦେଓଯାତେହି ତାର ଆନନ୍ଦ । ଉଦାରତା ମନକେ ପ୍ରଶାସନିତେ ଭାରିୟେ ଦେଇ ।

ଅନ୍ୟଦିକେ ବ୍ୟକ୍ତିଶାର୍ଥୀର ଚିନ୍ତା ଆମାଦେର ମନକେ ସଂକିର୍ଣ୍ଣ କରେ ତୋଳେ । ତଥନ ଆମରା ସମାଜେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟଦେର ସାର୍ଥୀର କଥା, ସୁଖେର କଥା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳେର କଥା ଭୁଲେ ଯାଇ । ତାତେ ସମାଜେର ଉନ୍ନତି ଓ ଅଗ୍ରଗତି ବାଧାଗ୍ରହଣ ହୁଏ । ସୁତରାଂ ସମାଜେର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାରତା ଖୁବଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ହିନ୍ଦୁଧର୍ମଗ୍ରହସମୁହେ ଉଦାରତାର ଅନେକ ଉପାଧ୍ୟାନ ରଯେଛେ । ଝବି ବଶିଷ୍ଠ ବାରବାର ବିଶ୍ୱମିତ୍ରେର ପ୍ରତି ଉଦାରତା ଦେଖିଯେଛେ । ଦେବତାଦେର ମଙ୍ଗଳେର ଜନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁନିର ଆତ୍ମତ୍ୟାଗେର ଉଦାରତା ସର୍ବାକ୍ଷରେ ଲେଖା ରଯେଛେ ।

ଆମରାଓ ଆମାଦେର ଆଚରଣେ ଉଦାରତାର ପରିଚୟ ଦେବ । ଅପରେର ସୁଖେ ସୁଖୀ ହେବ, ଅପରେର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ହେବ । ତାହଲେ ଆମାର ବ୍ୟକ୍ତିଚରିତ୍ର ଉନ୍ନତ ହେବ । ସମାଜେର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ।

ଏକକ କାଜ : ସମାଜେର ଦୁଃଖ ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନିତ କରେ ତାଦେର ଗୁଣଗୁଲୋ ଲେଖ ।

ପାଠ ୩ : ପରୋପକାର

ରାତୁଳ ଆବୁଲେର ସହପାଠୀ । ଓରା ଏକଇ ପାଡ଼ାଯ ଥାକେ । ମା, ବାବା ଆର ଆବୁଲ ତିନଙ୍କଙ୍କେ ନିଯେ ଓଦେର ପରିବାର । ଏକଦିନ ଆବୁଲ ସକ୍କୁଳେ ଏଲ ନା । ଆବୁଲ ତୋ ସକ୍କୁଳ କାମାଇ କରାର ମତୋ ଛେଲେ ନୟ । ରାତୁଳ ସକ୍କୁଳ ଥେକେ ଫେରାର ପଥେ ଗେଲ ଆବୁଲଦେର ବାଡ଼ି । ଗିଯେ ଦେଖେ ଆବୁଲେର ଖୁବ ଜ୍ଵର । କିନ୍ତୁ ଓର ବାବା ବାଡ଼ିତେ ନେଇ । ଆବୁଲେର ମା ଆବୁଲକେ ଫେଲେ କୋଥାଓ ଯେତେ ପାରଛେନ ନା । ତଥନ ରାତୁଳ ଏକଦୌଡ଼ୁ ଗିଯେ ଡାକ୍ତର ଡେକେ ଆନଳ ।

ଏଇ ସେ ଆବୁଲଦେର ପରିବାରେର ପ୍ରତି ରାତୁଲେର ଆଚରଣ, ଏକେଇ ବଲେ ପରୋପକାର ।

‘ଉପକାର’ ମାନେ ଭାଲୋ କରା । ପରେର ଭାଲୋ କରାର ନାମ ପରୋପକାର । କୋନୋ ସାର୍ଥୀର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ନା କରେ ପରେର ମଙ୍ଗଳେର ଜନ୍ୟ ସେ କାଜ କରା ହୁଏ, ତାକେଇ ବଲେ ପରୋପକାର ।

ପରୋପକାରେର ପରିଚୟ ପାଇ କବି କାମିନୀ ରାୟେର ଏକଟି କବିତା । ତିନି ଲିଖେଛେ :

ପରେର କାରଣେ ସାର୍ଥ ଦିଯା ବଲି

ଏ ଜୀବନ ମନ ସକଳଇ ଦାଓ,

ତାର ମତୋ ସୁଖ କୋଥାଓ କି ଆଛେ

ଆପନାର କଥା ଭୁଲିଯା ଯାଓ ।

ପରୋପକାରେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେବ ଜୀବେର ସେବା କରା ହୁଏ । ଯେହେତୁ ଜୀବେର ମଧ୍ୟେ ଆତ୍ମାରୂପେ ଈଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥାନ କରେନ, ତାଇ ପରୋପକାରେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଈଶ୍ୱରେରଇ ସେବା କରା ହୁଏ । ପରୋପକାର କରିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦାର ହୁଏ । ତାର ମନେ ପ୍ରଶାସନ ଆସେ । କାରଣ ପରୋପକାର କରାର ମଧ୍ୟେ ଏକ ଧରନେର ଆତ୍ମତ୍ୱ ଆଛେ । ପରୋପକାରେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ

পাঠ ১ : ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক

সহিষ্ণুতা, শ্রমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংয়ম, বৃদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্ষেত্র ধর্মের দশটি লক্ষণ রয়েছে। এগুলো এক-একটি নৈতিক গুণ। যিনি নৈতিক গুণগুলো অর্জন করেন এবং জীবনে ও সমাজে প্রয়োগ করেন, তিনি ধার্মিক বলে বিবেচিত হন। লোকে তাকে ভালো মানুষ বলে। তিনিই সমাজের জ্ঞানী মানুষ।

জ্ঞান কেবল অর্জন করলেই হয় না, তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হয়। সুতরাং ধর্মশিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, তাকেও জীবনে ও সমাজে প্রয়োগ করতে হয়। আর যখন ধর্ম থেকে পাওয়া জ্ঞান নিজেদের জীবন ও সমাজে প্রয়োগ করি, তখন তা হয় নৈতিক আচরণ। ধর্ম কেবল আচারে ও আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ নয়। ধর্ম একদিকে ‘আত্মাক্ষয়’ অর্থাৎ নিজের চিরমুক্তি ও শান্তির জন্য। অন্যদিক থেকে তা ‘জগন্তিতায়’ – জগতের ‘হিত’ অর্থাৎ কল্যাণের জন্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর অবস্থান করেন–এ ধর্মীয় শিক্ষা আমি গ্রহণ করলাম এবং এর মধ্যেই থেমে থাকলাম। তাতে কোনো লাভ নেই। যদি আমি জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর আছেন জেনে জীবকে ঈশ্বর জ্ঞানে শন্ম্বু করি এবং জীবের সেবা করি, তাহলেই সে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন সার্থক হবে।

এখানে ধর্মশিক্ষা ছিল : জীবকে ঈশ্বর বলে বিবেচনা করবে। আর এ থেকে নৈতিক শিক্ষা পাওয়া গেল : জীবের সেবা করা উচিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ধর্ম হচ্ছে নৈতিক শিক্ষার একটি উপায়। আর নীতি ছাড়া কেবল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।

নৈতিক শিক্ষা ধর্মীয় শুভ চেতনাকে জাহাত করে আর ধর্ম নৈতিক শিক্ষার ভিত্তিকে দৃঢ়তর করে তোলে। আমরা এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হিন্দুধর্মের আলোকে উদারতা, পরোপকার, সৎসাহস ও পরমতসহিষ্ণুতা এ চারটি-নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা করব এবং ধর্ম ও নৈতিকতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করব।

একক কাজ : ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার সম্পর্ক চারটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে লেখ।

পাঠ ২ : উদারতা

‘উদার’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে মহান, সজ্জন বা সাধু। উদারতা শব্দটি উদারের ভাব বোঝায়। অর্থাৎ উদারতা হচ্ছে চরিত্রের মহত্ব বা সাধুতা।

ঝাঁঝা সাধু, মহান – তাঁরা সকল মানুষকে সমান মনে করেন। ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ-সবাই তাঁদের কাছে সমান মর্যাদা পায়। সকল ধর্মের সকল সম্পদায়ের মানুষ তাঁর কাছে সমান। উদার ব্যক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে – উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুরুম্বকম্। এ কথার অর্থ হলো, উদারচরিত ব্যক্তিদের কাছে পৃথিবীর সকলেই ইষ্টিকূটম (আত্মীয়)। কেউ পর নয়। উদারতার পরিচয় পাই কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘মানুষ জাতি’ কবিতায়, তিনি লিখেছেন :

কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
তিতরে সবার সমান রাঙ।

অষ্টম অধ্যায়

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ

ধর্মপালনের মধ্য দিয়ে নৈতিক শিক্ষা অর্জন করা যায়। এ পুস্তকের পঠিত অধ্যায়সমূহ থেকে আমরা জেনেছি, নৈতিকতা গঠনে ধর্ম খুবই সহায়ক। এ ছাড়া ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দয়ার মতো নৈতিক গুণের দৃষ্টিভূক্ত ধর্মীয় উপাখ্যানের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছি। এ অধ্যায়ে আমরা উদারতা, পরোপকার, সেবা, সৎসাহস ও পরমতসহিষ্ণুতা প্রভৃতি নৈতিক মূল্যবোধসমূহ এবং এগুলো অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হব। নৈতিকতার পাশাপাশি মাদকাসন্ত্রির মতো একটি অনৈতিক কাজ এবং তা থেকে বিরত থাকার উপায় সম্পর্কে জেনে এ কাজকে আমরা ঘৃণা করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব
- উদারতা, পরোপকার, সেবা, সৎসাহস, পরমতসহিষ্ণুতা এ নৈতিক মূল্যবোধগুলো হিন্দুধর্মের আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এ নৈতিক মূল্যবোধগুলো অনুশীলনের গুরুত্ব ও গঠনের উপায় বর্ণনা করতে পারব
- মাদক ও মাদকাসন্ত্রির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- মাদক সেবন অনৈতিক কাজ- ব্যাখ্যা করতে পারব
- মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকার উপায় বর্ণনা করতে পারব
- সামাজিক জীবনে নৈতিক আচরণ করতে উদ্দৃষ্ট হব।

২. অনিমেষ একজন উদ্যমী ও প্রাণবন্ত যুবক। পাড়ার অন্য ছেলেদের নিয়ে একটি সমিতি গড়ে নানা প্রকার সমাজসেবামূলক কাজ করে। গ্রামের লোকের অর্থসংস্থানের জন্য তারা একটি কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। গ্রামে শিক্ষাবিষ্টারের জন্য ছেটদের পাঠশালা ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রও গড়ে তোলে। মানুষের বিপদে-আপদেও নানারকম সাহায্য-সহযোগিতা করে। এছাড়া মানুষের মানসিক ও আত্মিক উন্নয়নের জন্য সম্পর্ক পর কাজের অবসরে ছেলেদের নিয়ে গ্রামে নামসংকীর্তন ও ধর্মসভার আয়োজন করে। এভাবে অনিমেষ ও তার সমিতির নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনিমেষ তৃপ্ত এই ভেবে যে, সৎচিন্তা ও কাজের মাধ্যমে পাড়ার মানুষকে ঐক্যবন্ধ করেতে পেরেছে।
- ক. স্বামী বিবেকানন্দের দীক্ষাগ্রন্থ কে ?
- খ. ‘জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা’— ব্যাখ্যা কর।
- গ. অনিমেষের কার্যাবলি স্বামী বিবেকানন্দের কোন শিক্ষার সাথে মিল রয়েছে— ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘সৎচিন্তা ও কাজের দ্বারা মানুষের মধ্যে একাত্মতা গড়ে তোলা সম্ভব’ — কথাটি স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার প্রতিফলন — মূল্যায়ন কর।

৪. বনশ্রীর আচরণিক বৈশিষ্ট্যে নিচের কোন মহীয়সী নারীর আদর্শের মিল থাই পাই ?

- | | |
|------------|------------------|
| ক. মীরাবাঈ | খ. সারদাদেবী |
| গ. শচীদেবী | ঘ. শ্যামাসুন্দরী |

৫. সমাজজীবনে উক্ত মহীয়সী নারীর শিক্ষা হলো –

- i. জগৎকে আপনার করতে শেখ, কেউ পর নয়
- ii. সাধন ভজন প্রথম জীবনেই করে নেবে।
- iii. যে সংসারে শান্তি পায় না, সে সংসার ত্যাগ করলেও শান্তি পায় না।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) ii ও iii |
| গ) i ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

৬. উক্ত শিক্ষার সাথে বাস্তব জীবনের মিল রয়েছে –

- i. দ্বিজেন সমাজের সকলকেই আপন মনে করে।
- ii. মালা বাল্যকাল থেকেই নিষ্ঠার সাথে জীবসেবা ও ধর্মকর্ম করে।
- iii. সংসারে অশান্তির কারণে কমল সংসার ত্যাগ করল, কিন্তু শান্তি পেল না।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক) i ও ii | খ) i ও iii |
| গ) ii ও iii | ঘ) i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. অধ্যাপিকা চিত্রলেখা কৃষ্ণতন্ত্র, অত্যন্ত মেধাবী ও অমায়িক। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অধ্যাপনা করার পাশাপাশি মানুষের জাগতিক ও আত্মিক উন্নয়নমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাঁর সন্তানের বিয়ে অন্য বর্ণে সম্মত করেছেন। তিনি সবসময় মানুষের ও সমাজের উন্নতির কথা ভাবেন। উদারতা ও ভালোবাসা দিয়ে সবাইকে হাসিমুখে জয় করেন। তাঁর এই নিরহংকার আদর্শ সকলকে আকৃষ্ট করে। যেকোনো বাধাবিপন্তি আসলেও তিনি তা হাসিমুখে জয় করেন।

ক. মহাপুরুষ কাকে বলে ?

- খ. কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার- বাণীটির অর্থ বুঝিয়ে লেখ।
- গ. শ্রীচৈতন্যের আদর্শের কোন দিকটি অধ্যাপিকা চিত্রলেখার আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে, ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. নিরহংকার আদর্শ সবাইকে আকৃষ্ট করে- উদ্দীপক ও শ্রীচৈতন্যের দৃষ্টান্তের আলোকে উন্নিটি বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্নগুলোর সঠিক্ষিণ উত্তর দাও :

১. গোপেরা গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনে গেল কেন ?
২. বৎসাসুর কীভাবে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার চেষ্টা করেন ?
৩. কীভাবে কেশব মিশ্রের অহংকারের পতন হয় ?
৪. সমাজের ওপর প্রভু জগদম্ভুর শিক্ষার প্রভাব দ্রষ্টান্ত সহকারে বর্ণনা কর।
৫. সারদা দেবীর শিক্ষা আমরা কীভাবে বাস্তবে কাজে লাগাতে পারি ?

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. শ্রীকৃষ্ণের কালীয় নাগ দমনের শিক্ষা সমাজজীবনে কীভাবে প্রয়োগ করা যায় ?
২. স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগোতে উপস্থাপিত বক্তৃতার ফলাফল মূল্যায়ন কর।
৩. ‘পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই’ – বাণীটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
৪. কীভাবে রামপ্রসাদের সাধনা সার্থক হয় ?
৫. হরিজন সম্প্রদায়ের ব্রজজন হয়ে ওঠার কাহিনির শিক্ষা ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিম্নাইয়ের পিতার নাম কী ?

ক. কেশব মিশ্র	খ. জগন্নাথ মিশ্র
গ. নীলাম্বর মিশ্র	ঘ. জগৎ মিশ্র

২. কালীয় দমনের দ্বারা উপকৃত হয় –

ক. বলরাম	খ. শ্রীকৃষ্ণ
গ. জনগণ	ঘ. কালিন্দী

৩. আমাদের আচরণ থেকে যে বিষয়গুলো ত্যাগ করা উচি তা হলো –

i. পরনিন্দা	খ) i ও iii
ii. মিথ্যাচার	ঘ) i, ii ও iii
iii. কৃতজ্ঞতাবোধ	

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii	খ) i ও iii
গ) ii ও iii	

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪, ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বনশ্রী স্বামীর নির্দেশমতো নিষ্ঠার সাথে ধর্মকর্ম ও সাংসারিক দায়-দায়িত্ব পালন করেন। শত কষ্টের
মধ্যেও তিনি হাসিমুখে কর্তব্য করে যান। তাই সকলেই তাঁকে ভালোবাসে।

প্রভু জগদম্ভুর কয়েকটি উপদেশ

১. এটা প্লয়কাল, নাম সংকীর্তনই সত্য। এ যুগে একমাত্র হরিনামই সৃষ্টি রক্ষার উপায়। কেবল হরিনাম কর, হরিনাম কর।
২. অষ্টবুধি হয়ে পিতা-মাতার মনে কষ্ট দিতে নেই। যে সংসারে শান্তি পায় না, সে সংসার ত্যাগ করলেও শান্তি পায় না।
৩. বৃথা বাক্যব্যয় দুর্ভাগ্য। পরচর্চা কর্ণে বা অস্তরে স্থান দিও না। পরচর্চা, পরনিন্দা ত্যাগ কর। ঘরের দেয়ালে লিখে রেখ, পরচর্চা নিষেধ।

শিক্ষা : প্রভু জগদম্ভুর জীবনী থেকে আমরা এই নৈতিক শিক্ষা পাই যে, সব মানুষ সমান, কেউ উঁচু-নীচু নয়। কোনো মানুষই ঘূণ্য বা অস্পৃশ্য নয়। সমাজে সকলেরই সমান অধিকার। পিতা-মাতাকে কষ্ট দিতে নেই। সাধন করতে সংসার ত্যাগ করা লাগে না। পরনিন্দা, পরচর্চা ভালো নয়। এগুলো ত্যাগ করতে হবে। এই শিক্ষাগুলো আমরাও আমাদের জীবনে মেনে চলব।

একক কাজ : প্রভু জগদম্ভুর উপদেশসমূহ কীভাবে নিজের জীবনে প্রয়োগ করবে ?
দলীয় কাজ: তোমাদের জানা কোনো মহাপুরুষ বা মহীয়সী নারী সম্পর্কে দশটি বাক্য লেখ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. শ্রীকৃষ্ণ হৃদে কালীয়কে দমন করেছিলেন।
২. শচীদেবী বিষবৃক্ষের মূলে কৃত্তরাঘাত করেন।
৩. ক্লাসে নরেন্দ্রনাথের আচরণে প্রকাশ পায়।
৪. জমিদার দুর্গাচরণের অনুসরণে আমরা গুণীর করব।

ডান পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সঙ্গে মিল কর :

বাম পাশ	ডান পাশ
১. শ্রীকৃষ্ণ	নির্ভীকতা
২. নিমাইয়ের পাঞ্চিত্য প্রকাশ পায়	নিজের দোষ দেখা
৩. শান্তির ভয় না করে সত্য প্রকাশ করাকে বলে	রামপ্রসাদ
৪. মনোমালিন্য রোধ করার ভালো উপায় আগে	যুক্তিখনের দ্বারা
৫. ‘কবিরঞ্জন’ উপাধি পেয়েছিলেন	দিব্যজ্ঞানের অধিকারী
	দুর্গাচরণ

ଜୀବ ଦେବା କରିବେ । କେନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ମାଝେ ଈଶ୍ଵର ବିଦ୍ୟମାନ । ତାଇ ବୃକ୍ଷ-ଲତା, ପାଥ-ପାଥାଳି ପରିଚର୍ଯ୍ୟ କରାଏ ଦେବାର ଅଂଶ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଶ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବଲେଛେ - ‘ଜୀବେ ପ୍ରେମ କରେ ସେଇ ଜନ ସେଇ ଜନ ଦେବିଛେ ଈଶ୍ଵର’ ।

ପାରିବାରିକ ଜୀବନେ ତଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନେ ଦେବାର ଶୁରୁତ୍ୱ ଅପରିସୀମ । ପରିବାରେର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଏକେ ଅପରକେ ସାଧ୍ୟତାବେ ଦେବା କରା ଉଚିତ । ସମାଜେର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଦେବାପରାଯଣ । ଚିକିତ୍ସକ ରୋଗୀରେ ଦେବାର ମାଧ୍ୟମେ ସୁହୃ କରିଲେ ଦେଖାନେଇ ତାର ସାର୍ଥକତା । ଗରିବ-ଦୁଃଖୀ, ଅନାଥକେ ଦେବା କରିଲେ ମୂଳତ ଈଶ୍ଵରରେ ଦେବା କରା ହେ । ମାତୃଭୂମି ଆମାଦେର ମା । ଯାଯେର ମତୋ ମାତୃଭୂମିକେ ଆମାଦେର ଦେବା କରିବେ ହେ ।

ଆମରା ପରିବାରେର ସକଳ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଯ-ସଜନ, ସମାଜେର ସବାଇକେ ସାଧ୍ୟମତୋ ଦେବା କରିବ । ବୃକ୍ଷ-ଲତାସହ ପ୍ରତିଟି ଜୀବକେ ଈଶ୍ଵରଙ୍ଗାନେ ଦେବା କରିବ । ବିଭିନ୍ନ ଦେବାମୂଳକ କାଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାକିବ ।

ପାଠ ୫ : ସଂସାହସ

ସାହସ ଶପଟିର ମାନେ ହଛେ ତୟ ନା ପେଯେ କୋନୋ କାଜ କରିବେ ଏଗିଯେ ଯାଉୟା । ନିଜେର ବିପଦ ହବେ ଜେନେବେ କଳ୍ୟାଣକର କୋନୋ କାଜେ ବୌପିଯେ ପଡ଼ାର ଯେ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତାର ନାମ ‘ସଂସାହସ’ । ଜୀବନେ ଚଲାର ପଥେ ସଂସାହସ ଦେଖାନୋର ପ୍ରୋତ୍ସମାନରେ ରଯେଛେ । ସଂସାହସ ମନୋବଳ ବାଡ଼ାଯ । ନିର୍ଭୀକତାର ସଜ୍ଜେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ମୁଖୋମୁଖ୍ୟ ଦୀଢ଼ାତେ ଶେଖାଯ । ସବଳ ସଖନ ଦୂର୍ବଲେର ଉପର ଅଭ୍ୟାସର କରେ ତଥନ ସଂସାହସୀ ଦୂର୍ବଲେର ପକ୍ଷେ ଦୀଢ଼ାନ । ତାର ଜନ୍ୟ ଲଡ଼ାଇ କରେନ ।

ମହାଭାରତେ ଆହେ, ବାଲକ ଅଭିମନ୍ୟ ସଂସାହସ ଦେଖିଯେଛିଲେନ । ରାମାଯଣ, ମହାଭାରତ, ପୁରାଣ ପ୍ରତ୍ୟେ ଧର୍ମଗ୍ରହେ ସଂସାହସ ଦେଖାନୋର ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଯେଛେ । ଦେଶକେ ରକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ସଂସାହସ ଦେଖିଯେଛିଲେନ ଜଳା, ପ୍ରସୀର, ବିଦୁଲୀ ପ୍ରମୁଖ ।

ଆମାଦେର ଶ୍ରୀ ମାତୃଭୂମି ବାଲାଦେଶର ସାଧୀନତାର ଜନ୍ୟ ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧାରା ତଥକଣୀନ ପାକିସ୍ତାନେର ହାନାଦାର ବାହିନୀର ବିରଜନ୍ମୟ ଦୀଢ଼ିଯେଛିଲେନ । ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଦେର ଅନ୍ତରବଳ ବେଶ ଛିଲ ନା । କିନ୍ତୁ ତୀଦେର ବୁକେ ଛିଲ ସଂସାହସ । ତାଇ ସଂସାହସ ଦେଶପ୍ରେମିକେରେ ଏକଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ସଂସାହସ ଧର୍ମର ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଏକଟି ନୈତିକ ଗୁଣ ।



ଅଭିମନ୍ୟ

ଏକକ କାଜ : ସଂସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନେର ଚାରଟି କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନିତ କରେ ତୋମାର ଭୂମିକା କୀ ହେଉୟା ଉଚିତ ଲେଖ ।

ପାଠ ୬ : ପରମତସହିକୃତା

ଆମରା ମାନ୍ୟ । ମାନ୍ୟ ହିସେବେ ଆମାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ନିଜସ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଆହେ, ବୁଦ୍ଧି ଆହେ, ଜଗନ୍ନ-ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କେ ନିଜସ୍ଵ ଧାରଣା ଆହେ । ନିଜସ୍ଵ ମତ ଆହେ ।

আমার যেমন নিজস্ব মত আছে, তেমনি অন্যেরও নিজস্ব মত আছে। কিন্তু সাধারণত আমরা আমাদের নিজ নিজ মতকেই বড় করে দেখি। অন্যের মতের গুরুত্ব দিই না। অন্যের মত উপেক্ষা করি। আর এর ফলে আমাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। বিরোধ হানাহানি পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু আমরা যদি অন্যের মতের সারবস্তা বুঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তাহলে কোনো বিরোধ ঘটে না। বরং সকলের মজাল হয়।

এই যে অন্যের মতকে শন্দ্বা করা, অন্যের মতের প্রতি সহনশীল হওয়া, একেই বলে পরমতসহিষ্ণুতা।

পৃথিবীতে অনেক মত, অনেক পথ আছে। ধর্মপালনের ক্ষেত্রেও নানা মত ও পথের সৃষ্টি হয়েছে। সকল মত ও পথকে, সকল ধর্মকে শন্দ্বা জানানোর মধ্য দিয়ে পরমতসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়। প্রতির্থিত হয় সম্মুখীনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব খুব সহজ করে বলেছেন : যত মত, তত পথ। উপাস্যের নাম এবং উপাসনা ও জীবনাচরণের পদ্ধতির মধ্যে বিশিষ্টতা বিভিন্ন ধর্মমতের উভ্যের ঘটিয়েছে। আসলে উদ্দেশ্য সকলেরই এক। তা হচ্ছে মৃষ্টার কৃপা লাভ এবং জীব ও জগতের কল্যাণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যত্বে তাংস্তৈথেব ভজাম্যহম্।

মম বর্জানুবর্তত্বে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥(৪/১১)

অর্থাৎ যে যেভাবে বা যেরূপে আমাকে উপাসনা করে, আমি তাকে সেভাবেই সন্তুষ্ট করি। হে পার্থ (অর্জুন), মানুষেরা সকল প্রকারে আমার পথেরই অনুসরণ করে।

পরমতসহিষ্ণুতা সমাজের শৃঙ্খলার অন্যতম উপাদান। পরের মতকে স্বীকৃতি না দিলে এক মতের সাথে অন্য মতের বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। কেবল নিজের ধর্মমতকে শ্রেষ্ঠ মনে করলে, অন্য ধর্মমতের অনুসারীদের খাটো করা হবে।

এ রকম মতান্তর জন্ম দেয় ধর্মান্তর। আর ধর্মান্তর পরিণত হয় শৌড়ামিতে— হিন্দু সাম্প্রদায়িকতায়। সুতরাং ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পরমতসহিষ্ণুতা একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণ, ধর্মেরও অঙ্গ।

একক কাজ : সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের পাঁচটি ক্ষেত্র চিহ্নিত কর।

পাঠ ৭ : উদারতা, পরোপকার, সেবা, সৎসাহস ও পরমতসহিষ্ণুতা- এ নৈতিক গুণগুলো অনুশীলনের গুরুত্ব ও উপায়

উদারতা মানুষকে মহান করে। পরোপকার করলে সমাজের মজাল হয়। উদার ব্যক্তির একটি গুণও আবার পরোপকার করার মনোভাব। অন্যদিকে পরোপকার করা উদার ব্যক্তির একটি বৈশিষ্ট্য। একটির সঙ্গে আরেকটি জড়িত।

উদারতা ও পরোপকারের মধ্য দিয়ে ধর্ম পালিত হয় এবং নৈতিকতা অর্জন করা যায়। জীবকে সেবা করলে স্বয়ং ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়।

সৎসাহস হচ্ছে ভালো কাজে সাহস দেখানো। দুর্ঘটের দমন, ন্যায়বিচার, দেশরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সৎসাহসের প্রয়োজন।

পরমতসহিষ্ণুতা সম্মতি ও শান্তি স্থাপনের অন্যতম উপায়। পরমতসহিষ্ণুতা সমাজকে সুশৃঙ্খল রাখে। যখনই পরমতসহিষ্ণুতার অভাব ঘটে, তখনই উত্তর ঘটে সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতার। সুতরাং শান্তি, সম্মতি ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে পরমতসহিষ্ণুতা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

দলীয় কাজ : ‘উদারতা, পরোপকার, সৎসাহস ও পরমতসহিষ্ণুতাই ব্যক্তিকে উন্নত করে’—
উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

পাঠ ৮ : মাদক সেবন অনৈতিক কাজ

এবার একটি অনৈতিক কাজের কথা বলব, যা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। তা হলো মাদক সেবন। মাদক হচ্ছে এমন কিছু জিনিস, যা নেশার সূচিটি করে। যেমন – বিড়ি, সিগারেট, তামাক, মদ, গাঁজা, হেরোইন, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল ইত্যাদি। এছাড়া ঘুমের ওষুধ নামক চেতনাশিথিলকারী কিছু ওষুধও মাদক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মাদকাসক্তি

মাদকাসক্তি বলতে বোঝায় মাদক দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীলতা এবং মাদক গ্রহণের ঐকান্তিক আগ্রহ।

মাদক সেবন ও অনৈতিক কাজ

মাদক সেবন একটি অনৈতিক কাজ। মাদকসেবন ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি করে এবং পরিবার ও সমাজের অঙ্গজন দেকে আনে।

দৈহিক ক্ষতি

মাদকসেবন করলে নানা রুক্মের রোগ হয়। যেমন – খাবারে অরুচি, বদহজম বা হজমশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া, অপুষ্টি, শ্বাসনালির ক্ষতি, স্থায়ী কফ ও কাশি, ইঁপানি, ফুসফুসের ক্যাঙ্গার প্রভৃতি।

এ ছাড়া হৃদরোগও হতে পারে। কিন্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

মানসিক ক্ষতি

মাদক সেবনে নেশা হয়। মাদকাসক্ত অবস্থায় বিবেকবুদ্ধি লোপ পায়। তখন মাদকসেবী না-করতে পারে, এমন কোনো কাজ নেই।

আর্থিক ক্ষতি

মাদকদ্রব্য খেয়ের জন্য মাদকসেবীকে প্রতিদিন প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এ অর্থ যোগাড় করতে মাদকসেবী মা-বাবা আতীয়স্বজনের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। কখনও কখনও অসদৃশ্য অবলম্বন করে মাদকের জন্য অর্থ সঞ্চাহ করে। সুতরাং মাদক সেবন এমন একটি অনৈতিক কাজ, যা আরও অনেক অনৈতিক কাজে লিঙ্গ করে।

মাদক সেবনে পরিবার ও সমাজের অঙ্গভাগ হয়। পরিবারে শান্তি থাকে না। মাদকসেবী কখন কী করে বসে তার জন্য পরিবারের সকল সদস্য উদ্বিধ থাকে। সমাজেও এর প্রভাব পড়ে।

হিন্দুধর্ম অনুসারে মাদক সেবন বা নেশা করা মহাপাপ। মাদকসেবী মহাপাপী। কেবল তা-ই নয়। মাদকসেবীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বা চলাও মহাপাপ। সুতরাং মাদকাসন্তি থেকে আমরা বিরত থাকবই।

মাদকাসন্তি থেকে বিরত থাকার উপায় হচ্ছে :

১. মাদকসেবন মহাপাপ— ধর্মীয় এ অনুশাসন মেনে চলা।
২. মাদক সেবন অনৈতিক কাজ— সুতরাং নৈতিক দিক থেকেও আমরা মাদক গ্রহণ করব না।
৩. মাদকসেবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না-করা বা সম্পর্ক না-রাখা।
৪. প্রতিজ্ঞা করা :
মাদককে না বলব,
নীতিধর্ম মেনে চলব।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবে করতে হয়।
২. উদারতা মানবচরিত্রকে করে।
৩. সৎসাহস বাঢ়ায়।
৪. পরমতসহিষ্ণুতা সমাজে প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপাদান।
৫. ‘মাদক সেবন মহাপাপ’—এ ধর্মীয় অনুশাসন চলব।

ଡାଳ ପାଶ ଥେକେ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟାଖ୍ଷେ ନିଯ୍ୟେ ବାମ ପାଶେର ସାଥେ ମିଳ କର :

ବାମ ପାଶ	ଡାଳ ପାଶ
୧. ଧର୍ମ କେବଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକତାଯ	ଆତ୍ମଶିଳ୍ପିତ ଆଛେ
୨. ଉଦାର ଚରିତ୍ରେର ବ୍ୟକ୍ତିଦେର କାହେ	ନାନାରକମେର ରୋଗ ହୁଏ
୩. ପରୋପକାର କରାର ମଧ୍ୟେ ଏକ ଧରନେର	ଅନ୍ୟତମ ଉତ୍ସ
୪. ମାଦକ ସେବନ କରିଲେ	ପୃଥିବୀର ସକଳେଇ ଇଷ୍ଟକୁଟୁମ୍ବ ସୀମାବନ୍ଧ ନାହିଁ

ନିଚେର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ସଞ୍ଚେପେ ଉତ୍ସର ଦାଓ

- ‘ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଧର୍ମୀୟ ଶୁଭ ଚେତନାକେ ଜାଗତ କରେ’ – ଉତ୍ସିତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଯେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
- ଉଦାରତାର ଧାରଣାଟି ଉଦାହରଣସହ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
- କୀତାବେ ପରୋପକାର କରା ଯାଏ ? ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହକାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
- ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାୟ ସଂସାହସର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତସହ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର । ।
- ମାଦକ ସେବନେ ଦେହେର କୀ କ୍ଷତି ହତେ ପାରେ ?

ନିଚେର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ଉତ୍ସର ଦାଓ

- ଧର୍ମ ଓ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଉଦାହରଣସହ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
- ସମାଜ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଜୀବନେ ଉଦାରତା ଅନୁଶୀଳନେର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ।
- ସମାଜଜୀବନେ ପରୋପକାରେର ଉପାୟ ଚିହ୍ନିତ କରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖାଓ ।
- ମାଦକ ସେବନେର ଆର୍ଥ-ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ।

ବହୁନିର୍ବାଚନି ପ୍ରଶ୍ନ

- ଆତ୍ମଯାଗେର ନୈତିକ ଚେତନାକେ କୀ ବଙ୍ଗେ ?
- କ. ପରୋପକାର
- ଗ. ସତ୍ୟବାଦିତା
- ଖ. ଉଦାରତା
- ଘ. କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା

২. সৎসাহস বলতে বোঝায় –

- i. কোনো কাজে তয় না-পাওয়া
- ii. জীবনের ঝুকি নিয়ে বিপদ মোকাবেলা করা
- iii. দুর্বলের পক্ষে ন্যায়ের জন্য লড়ই করা।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৩. ‘যত মত, তত পথ’— এটি কার বাণী ?

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ক. শ্রী রামচন্দ্র | খ. শ্রী রামকৃষ্ণ |
| গ. শ্রী বিজয় কৃষ্ণ | ঘ. শ্রী রামপ্রসাদ |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সাধন মুখাজ্ঞী গত দুর্গোৎসবে বিজয়াদশমীর দিন মধ্যাহ্নভোজে গ্রামের সকল স্তরের মানুষকে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাদের সাথে বসে তিনিও আহার করেন। এতে প্রতিবেশি সুখেন চক্রবর্তী মুগ্ধ হয়ে তার আচরণ অনুশীলনে উদ্বৃদ্ধ হন।

৪. সাধন মুখাজ্ঞীর আচরণে কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে ?

- | | |
|-----------|------------|
| ক. ক্ষমা | খ. সৎসাহস |
| গ. উদারতা | ঘ. পরোপকার |

৫. উক্ত গুণটির অনুশীলনে সুখেনের করণীয় –

- ক. ভুলের জন্যে কাউকে শান্তি না-দেওয়া
- খ. জীবনের ঝুকি নিয়ে বিপদ মোকাবেলা
- গ. সকল মানুষকে সমান মর্যাদা প্রদান
- ঘ. পরের মঙ্গলে স্বার্থ ত্যাগ।

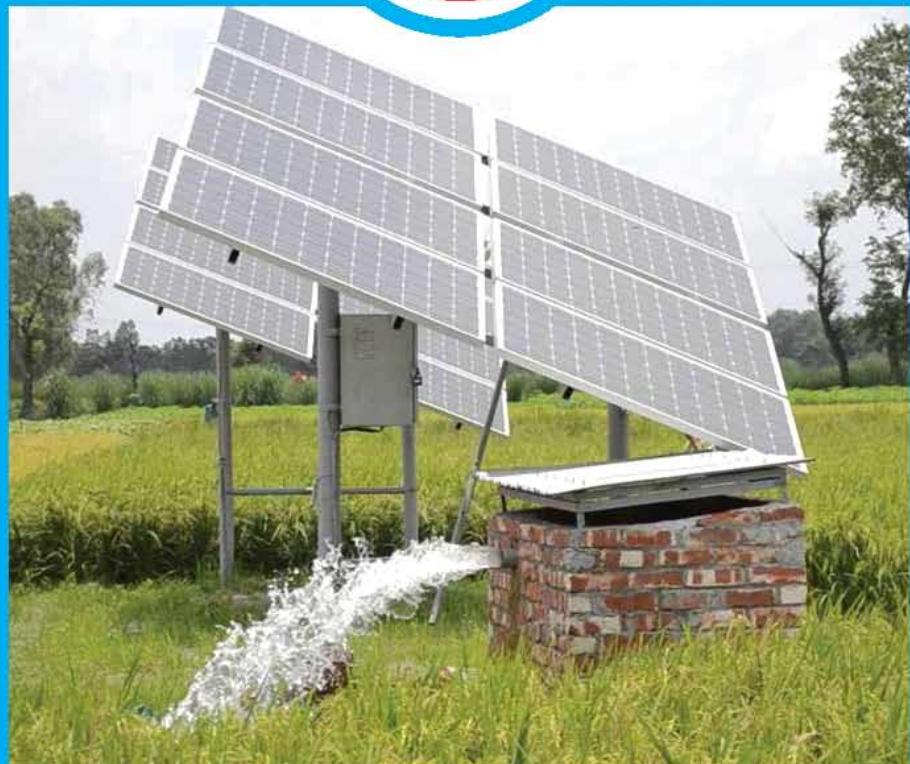
ସୂଜନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ

୧। ଶଶୁର-ଶାଶୁଡ଼ି, ଦେବର-ନନ୍ଦ, ଛେଳେ-ମେଯେ ନିଯେ ପୂର୍ବୀ ଦନ୍ତେର ସୁଖେର ସଂସାର । ତାର ସାମୀ ପ୍ରବାସେ ଚାକୁରି କରେନ । ତିନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ୟ ସହକାରେ ସଂସାରେ ସକଳ ଦାଯିତ୍ୱ ପାଲନ କରେନ । ତିନି ପରିବାରେର ବିଭିନ୍ନ କାଜ ସେମନ- ସନ୍ତାନେର ଶିକ୍ଷା, ସମ୍ପଦ କ୍ରୟ-ବିକ୍ରୟ, ବିବାହ ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷେତ୍ରେ ସଦସ୍ୟଦେର ମତାମତକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଯେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେନ । ଏତେ ପରିବାରେର ସବାଇ ତାକେ ପଛଦ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ।

- କ. ଧର୍ମେର କ୍ୟାଟି ଲକ୍ଷଣ ରଯେଛେ ?
- ଘ. ‘ଧର୍ମ ହଚ୍ଛେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର ଏକଟି ଉପାୟ’— ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
- ଗ. ପୂର୍ବୀ ଦନ୍ତେର ଚରିତ୍ରେ ଯେ ନୈତିକ ଗୁଣଟି ଫୁଟେ ଉଠେଛେ— ତା ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
- ଘ. ପରିବାର ଓ ସମାଜେ ଶୁଭେଲା ଆନନ୍ଦନେ ଉତ୍ତର ଗୁଣଟିର ଭୂମିକା ମୂଲ୍ୟାଯନ କର ।

ସମାପ୍ତ

শাধীনতাৰ
৫০
বছৰ
উন্নয়ন আমাৰও



সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প

প্রধানমন্ত্রী 'শেখ হাসিনাৰ উদ্যোগ ঘৱে ঘৱে বিদ্যুৎ' এই শ্লেষানকে সামনে নিয়ে প্রচলিত পক্ষতত্ত্বে বিদ্যুৎ উৎপাদনেৰ পাশাপাশি নৰায়নযোগ্য জ্বালানি যেমন, সৌৱিদ্যুৎ, উইভিমিল ও বামোগ্যাস থেকেও বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। সূর্য থেকে বিকিৰণ হওয়া তাপশক্তিকে রাসায়নিক বিক্রিয়াৰ মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰা হয় তাই হলো সৌৱিদ্যুৎ। বাহ্লাদেশে অফ-গ্রিড এলাকায় (চৰ, হাণড় ও দুর্গম পাহাড়ি এলাকা) সৌৱিদ্যুৎ মানুষেৰ জীবনযাত্রাকৰ মানে পৱিতৰণ এনেছে। জাতীয় প্ৰৱৃক্ষি অৰ্জন, দায়িত্ব বিবোচন এবং দেশেৰ আৰ্থ-সামাজিক উন্নয়নেৰ অন্যতম চালিকাশক্তি বিদ্যুৎ। দেশেৰ বিদ্যুৎ খাতে অভূতপূৰ্ব উন্নয়নেৰ কলে অবকাঠামো, কৃষি ও শিল্প খাতে ইতিবাচক প্ৰভাৱ পড়েছে এবং নতুন কৰ্মসংহান সৃষ্টি হয়েছে। সৌৱিদ্যুৎ পৱিতৰণ-বাক্ষৰ হওয়াৰ বেসৱকাৰি পৰ্যামে ভবনেৰ ছাদে সৌৱিদ্যুৎ উৎপাদন জনপ্ৰিয় কৰাৰ জন্য 'নেট মিটারিং গাইডলাইন' প্ৰণয়ন কৰা এবং বিদ্যুৎবিহীন এলাকাৰ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অঞ্চলিকাৰ ভিত্তিতে সোলাৱ প্যানেল ছাপন কৰা হচ্ছে।



জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির লাভ

-শ্রী রামকৃষ্ণ

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই জীবনে সাফল্য অর্জন করতে হবে

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টেল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য